গৃহদাহ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিরাজ-বৌ

১

হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে দুই ভাই নীলাম্বর ও পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী বাস করিত। ও অঞ্চলে নীলাম্বরের মত মড়া পোড়াইতে, কীর্ত্তন গায়িতে, খোল বাজাইতে এবং গাঁজা খাইতে কেহ পারিত না। তাহার উন্নত গৌরবর্ণ দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল, গ্রামের মধ্যে পরোপকারী বলিয়া তাহার যেমন খ্যাতি ছিল, গোঁয়ার বলিয়া তেমনই একটা অখ্যাতিও ছিল; কিন্তু ছোটভাই পীতাম্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক। সে খর্ব্বকায় এবং কৃশ। মানুষ মরিয়াছে শুনিলেই তাহার সন্ধ্যার পর গা কেমন করিত। দাদার মত অমন মূর্খও নয়, গোঁয়ারতুমির ধার দিয়াও সে চলিত না। সকাল-বেলা ভাত খাইয়া দপ্তর বগলে করিয়া হুগলীর আদালতের পশ্চিম দিকের একটা গাছতলায় গিয়া বসিত এবং সমস্ত দিন আর্জ্জি লিখিয়া যা উপার্জ্জন করিত, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়া সেগুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া ফেলিত। রাত্রে ঘরের দরজা-জানালা স্বহস্তে বন্ধ করিত এবং স্ত্রীকে দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করাইয়া লইয়া তবে ঘুমাইত।

আজ সকালে নীলাম্বর চণ্ডীমণ্ডপের একধারে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তাহার অনূঢ়া ভগিনী হরিমতি নিঃশব্দে আসিয়া পিঠের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাদার পিঠে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নীলাম্বর হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া, আন্দাজ করিয়া এক হাত তাহার বোনের মাথার উপর রাখিয়া, সস্নেহে কহিল, সকাল-বেলাই কান্না কেন দিদি?

হরিমতি মুখ রগড়াইয়া পিঠময় চোখের জল মাথাইয়া দিতে দিতে জানাইল যে, বৌদি গাল টিপিয়া দিয়াছে এবং 'কাণী' বলিয়া গাল দিয়াছে।

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, তোমাকে 'কাণী' বলে? অমন দুটি চোখ থাক্‌তে যে কাণী বলে, সে-ই কাণী; কিন্তু গাল টিপে দেয় কেন?

হরিমতি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মিছিমিছি।

মিছিমিছি? আচ্ছা, চল ত দেখি, বলিয়া বোনের হাত ধরিয়া ভিতরে আসিয়া ডাকিল, বিরাজ-বৌ?

বড়বধূর নাম বিরাজ। তাহার নয় বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া সকলে বিরাজ-বৌ বলিয়া ডাকিত। এখন তাহার বয়স উনিশ-কুড়ি। শাশুড়ীর মরণের পর হইতে সে গৃহিণী। বিরাজ অসামান্যা সুন্দরী। চার-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়া আঁতুড়েই মরিয়াছিল, সেই অবধি সে নিঃসন্তান। রান্নাঘরে কাজ করিতেছিল, স্বামীর ডাকে বাহিরে আসিয়া, ভাই-বোনকে একসঙ্গে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, পোড়ারমুখি আবার নালিশ কর্ত্তে গিয়েছিলি?

নীলাম্বর বলিল, কেন যাবে না? তুমি 'কাণী' বলেছ, সেটা তোমার মিছে কথা; কিন্তু তুমি গাল টিপে দিলে কেন?

বিরাজ কহিল, অত বড় মেয়ে, ঘুম থেকে উঠে, চোখে মুখে জল দেওয়া নেই, কাপড় ছাড়া নেই, গোয়ালে ঢুকে বাছুর খুলে দিয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে। আজ এক ফোঁটা দুধ পাওয়া গেল না। ওকে মারা উচিত।

নীলাম্বর বলিল, না। ঝিকে গয়লা-বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া উচিত; কিন্তু তুমি দিদি, হঠাৎ বাছুর খুলে দিতে গেলে কেন? ও কাজটা ত তোমার নয়।

হরিমতি দাদার পিছনে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি মনে করেছি দুধ দোয়া হয়ে গেছে।

আর কোন দিন মনে ক'রো! বলিয়া বিরাজ রান্নাঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, তুমিও একদিন ওর বয়সে মায়ের পাখী উড়িয়ে দিয়েছিলে। খাঁচার দোর খুলে দিয়ে মনে করেছিলে, খাঁচার পাখী উড়তে পারে না। মনে পড়ে?

বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, পড়ে; কিন্তু ও বয়সে নয়—আরও ছোট ছিলাম। বলিয়া কাজে চলিয়া গেল।

হরিমতি বলিল, চল না, দাদা, বাগানে গিয়ে দেখি, আম পাকল কি না।

তাই চল দিদি!

যদু চাকর ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, নারাণ ঠাকুরদা ব'সে আছেন।

নীলাম্বর একটু অপ্রতিভ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, এর মধ্যেই এসে ব'সে আছেন?

রান্নাঘরের ভিতর হইতে বিরাজ এ কথা শুনিতে পাইয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল, যেতে ব'লে দে খুড়োকে। স্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিল, সকাল-বেলাতেই যদি ও সব খাবে ত আমি মাথা খুঁড়ে মরব। কি সব হচ্ছে আজ-কাল!

নীলাম্বর জবাব দিল না, নিঃশব্দে ভগিনীর হাত ধরিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া বাগানে চলিয়া গেল।

এই বাগানটির এক প্রান্ত দিয়া শীর্ণকায়া সরস্বতী নদীর মৃদু স্রোতটুকু গঙ্গাযাত্রীর শ্বাস-প্রশ্বাসের মত বহিয়া যাইতেছিল। সর্ব্বাঙ্গ শৈবালে পরিপূর্ণ; শুধু মাঝে মাঝে গ্রামবাসীরা জল আহরণের জন্য কূপ খনন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহারই আশে-পাশে শৈবালমুক্ত অগভীর তলদেশের বিভক্ত শুক্তিগুলি স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়া অসংখ্য মাণিক্যের

মত্ত সূর্য্যালোকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তীরে এক খণ্ড কাল পাথর সমীপস্থ সমাধিস্তূপের প্রাচীর-গাত্র হইতে কোন এক অতীত দিনের বর্ষার খরস্রোতে স্খলিত হইয়া আসিয়া পড়িয়াছিল। এই বাড়ীর বধূরা প্রতি সন্ধ্যায় তাহারই একাংশে মৃতাত্মার উদ্দেশে দীপ জ্বালিয়া দিয়া যাইত। সেই পাথরখানির একধারে আসিয়া নীলাম্বর ছোটবোনটির হাত ধরিয়া বসিল। নদীর উভয় তীরেই বড় বড় আমবাগান এবং বাঁশঝাড়। দুই-একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থ, বট নদীর উপর পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া শাখা মেলিয়া দিয়াছে। ইহাদের শাখায় কতকাল কত পাখী নিরুদ্বেগে বাসা বাঁধিয়াছে, কত শাবক বড় করিয়াছে, কত ফল খাইয়াছে, কত গান গাহিয়াছে; তাহারই ছায়ায় বসিয়া, ভাই-বোন ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ হরিমতি দাদার ক্রোড়ের কাছে আরও একটু সরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা দাদা, বৌদি কেন তোমাকে বোষ্টমঠাকুর ব'লে ডাকে?

নীলাম্বর গলায় তুলসীর মালা দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, আমি বোষ্টম ব'লেই ডাকে।

হরিমতি অবিশ্বাস করিয়া বলিল, যাঃ—তুমি কেন বোষ্টম হবে? তারা ত ভিক্ষে করে। আচ্ছা, ভিক্ষে কেন করে দাদা?

নেই ব'লেই করে।

হরিমতি মুখ পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিছু নেই তাদের? তাদের পুকুর নেই, বাগান নেই, ধানের গোলা নেই—কিচ্ছুটি নেই?

নীলাম্বর সস্নেহে হাত দিয়া বোনটির মাথার চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া বলিল, কিচ্ছুটি নেই দিদি, কিচ্ছুটি নেই—বোষ্টম হ'লে কিচ্ছুটি থাকতে নেই।

হরিমতি বলিল, তবে সবাই কেন তাদের কিছু কিছু দেয় না?

নীলাম্বর বলিল, তোর দাদাই কি কিছু তাদের দিয়েছে রে?

কেন দাও না দাদা, আমাদের ত এত আছে?

নীলাম্বর সহাস্তে বলিল, তবুও তোর দাদা দিতে পারে না ; কিন্তু তুই যখন রাজার বৌ হবি দিদি, তখন দিস্।

হরিমতি বালিকা হইলেও কথাটায় লজ্জা পাইল। দাদার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, যাঃ!

নীলাম্বর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিল। মা-বাপ-মরা এই ছোটবোনটিকে সে যে কত ভালবাসিত তাহার সীমা ছিল না। তিন বছরের শিশুকে বড়-বৌ-ব্যাটার হাতে স'পিয়া দিয়া তাহাদের বিধবা জননী সাত বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করেন। সেই দিন হইতে নীলাম্বর ইহাকে মানুষ করিয়াছে। সমস্ত গ্রামের রোগীর সেবা করিয়াছে, মড়া পোড়াইয়াছে, কীর্ত্তন গাহিয়াছে, গাঁজা খাইয়াছে ; কিন্তু জননীর শেষ আদেশটুকু এক মুহূর্ত্তের জন্য অবহেলা করে নাই। এমন করিয়া বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিল বলিয়াই, হরিমতি মায়ের মত অসঙ্কোচে দাদার বুকে মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অদৃশ্যে পুরাতন ঝির গলা শোনা গেল—পুঁটি, বৌমা ডাক্‌ছেন দুধ খাবে এস।

হরিমতি মুখ তুলিয়া মিনতির স্বরে বলিল, দাদা, তুমি ব'লে দাও না এখন দুধ খাব না।

কেন খাবে না দিদি ?

হরিমতি বলিল, এখনও আমার একটুও ক্ষিদে পায় নি।

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, সে আমি যেন বুঝলাম, কিন্তু যে গাল টিপে দেবে, সে ত বুঝবে না!

দাসী অলক্ষ্যে থাকিয়া আবার ডাক দিল, পুঁটি!

নীলাম্বর তাহাকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া দিয়া বলিল, যা তুই কাপড় ছেড়ে দুধ খেয়ে আয় বোন, আমি ব'সে আছি।

হরিমতি অপ্রসন্ন মুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সেই দিন দুপুর-বেলা বিরাজ স্বামীকে ভাত বাড়িয়া দিয়া অদূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আচ্ছা, তুমিই বলে দাও, আমি কি দিয়ে রোজ রোজ তোমার পাতে ভাত দি? তুমি এ খাবে না, সে খাবে না—শেষ কালে কি না, মাছ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলে!

নীলাম্বর খাইতে বসিয়া বলিল, এই ত এত তরকারি হয়েচে।

এত কত! ঐ থোড় বড়ি খাড়া, আর খাড়া বড়ি থোড়! এ দিয়ে কি পুরুষমানুষ খেতে পারে? এ সহর নয় যে, সব জিনিস পাওয়া যাবে; পাড়াগাঁ, এখানে সম্বলের মধ্যে ঐ পুকুরের মাছ—তাও কি না তুমি ছেড়ে দিলে? পুঁটি কোথায় গেলি? বাতাস কর্‌বি আয়—না, সে হবে না—আজ যদি একটি ভাত পড়ে থাকে ত তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মর্‌ব!

নীলাম্বর হাসিমুখে নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল।

বিরাজ রাগিয়া বলিল, কি হাস, আমার গা জ্বালা করে! দিন দিন তোমার খাওয়া কমে আস্‌ছে—সে খবর রাখ? গলার হাড় বেরোবার যো হচ্চে, সে দিকে চেয়ে দেখ?

নীলাম্বর বলিল, দেখেচি, ও তোমার মনের ভুল।

বিরাজ কহিল, মনের ভুল? তুমি গুণে একটি ভাত কম খেলে আমি বলে দিতে পারি, রতি-পরিমাণ রোগা হলে আমি গায়ে হাত দিয়ে ধ'রে দিতে পারি তা জান? যা ত পুঁটি, পাখা রেখে রান্নাঘর থেকে তোর দাদার দুধ নিয়ে আয়।

হরিমতি একধারে দাঁড়াইয়া বাতাস সুরু করিয়াছিল, পাখা রাখিয়া দুধ আনিতে গেল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌বার ঢের সময় আছে। আজ ও-বাড়ীর পিসিমা এসেছিলেন, শুনে বললেন, এত কম বয়সে মাছ ছেড়ে দিলে চোখের জ্যোতি ক'মে যায়, গায়ের জোর ক'মে যায়—না না, সে

হবে না—শেষকালে কি হ'তে কি হবে, তোমাকে মাছ ছাড়তে আমি দেব না।

নীলাম্বর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার হ'য়ে তুই বেশি ক'রে খাস তা হ'লেই হবে।

বিরাজ রাগিয়া গিয়া বলিল, হাড়ি-কেওড়ার মত আবার তুইতোকারি!

নীলাম্বর অপ্রতিভ হইয়া বলিল, মনে থাকে না রে! ছেলে-বেলার অভ্যাস যেতে চায় না—কত তোর কান ম'লে দিয়েছি মনে আছে?

বিরাজ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মনে আবার নেই? ছোটটি পেয়ে আমার উপর কম অত্যাচার করেচ তুমি! বাবাকে লুকিয়ে, মাকে লুকিয়ে, আমাকে দিয়ে তুমি কত তামাক সাজিয়েছ! কম শয়তান লোক তুমি!

নীলাম্বর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—আজও সেই সব মনে আছে; কিন্তু তখন থেকেই তোকে ভাল বাসতাম।

বিরাজ হাসি চাপিয়া বলিল, জানি; চুপ কর পুঁটি আসচে।

হরিমতি দুধের বাটি পাতের কাছে রাখিয়া দিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। বিরাজ উঠিয়া গিয়া হাত ধুইয়া আসিয়া স্বামীর সন্নিকটে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আমাকে পাখাটা দে পুঁটি—যা তুই খেল্‌গে যা।

পুঁটি চলিয়া গেলে, বিরাজ বাতাস করিতে করিতে বলিল, সত্যি বল্‌চি—অত ছোট-বেলায় বিয়ে হওয়া ভাল নয়।

নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিল, কেন নয়? আমি ত বলি, মেয়েদের খুব ছোট-বেলায় বিয়ে হওয়াই ভাল।

বিরাজ মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমার কথা আলাদা, কেননা আমি তোমার হাতে পড়েছিলাম। তা ছাড়া, আমার দুষ্ট বজ্জাত জা-ননদ

ছিল না—আমি দশ বছর থেকেই গিন্নী ; কিন্তু আর পাঁচজনের ঘরেও দেখ্‌ছি ত, ঐ যে ছোট-বেলা থেকে বকা-ঝকা মার-ধোর সুরু হয়ে যায়—শেষে বড় হলেও সে দোষ ঘোচে না—বকা-ঝকা থামে না। সেই জন্যেই ত আমি আমার পুঁটির বিয়ের নামটি করি নে, নইলে পরশুও রাজেশ্বরী-তলার ঘোষালদের বাড়ী থেকে ঘট্‌কী এসেছিল ; সর্ব্বাঙ্গে গয়না—হাজার টাকা নগদ—তবুও আমি বলি, না—আরও দুবছর থাক।

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুই কি পণ নিয়ে মেয়ে বেচবি না কি রে!

বিরাজ বলিল, কেন নেব না ? আমার একটা ছেলে থাক্‌লে টাকা দিয়ে মেয়ে ঘরে আন্‌তে হ'ত না ? আমাকে তোমরা তিনশ টাকা দিয়ে কিনে আন নি ? ঠাকুরপোর বিয়েতে পাঁচশ টাকা দিতে হয় নি ? না না, তুমি আমার ও সব কথায় থেক না—আমাদের যা নিয়ম, আমি তাই করব।

নীলাম্বর অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আমাদের নিয়ম মেয়ে বেচা—এ খবর কে তোকে দিলে ? আমরা পণ দিই বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে এক পয়সাও নিই নে—আমি পুঁটিকে দান করব।

বিরাজ স্বামীর মুখ-চোখের ভাব লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা, তাই ক'রো—এখন খাও—ছুতো ক'রে যেন উঠে যেও না।

নীলাম্বর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমি ছুতো ক'রে উঠে যাই ?

বিরাজ কহিল, না—একদিনও না। ও দোষটি তোমার শত্তুরেও দিতে পারবে না। এ জন্যে কতদিন যে আমাকে উপোস ক'রে কাটাতে হয়েচে, সে ছোটবৌ জানে। ও কি ? খাওয়া হয়ে গেল নাকি ?

বিরাজ ব্যস্ত হইয়া পাখাটা ফেলিয়া দিয়া দুধের বাটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, মাথা খাও, উঠ না—ও পুঁটি শীগ্‌গির যা—ছোটবৌর কাছ থেকে

ছুটো সন্দেশ নিয়ে আয়—না না, ঘাড় নাড়্‌লে হবে না—তোমার কথ্‌খন পেট ভরে নি—মাইরি বল্‌চি, আমি তা হ'লে ভাত খাব না—কাল রাত্তির একটা পর্য্যন্ত জেগে সন্দেশ তৈরি করেচি।

হরিমতি একটা রেকাবিতে সবগুলা সন্দেশ লইয়া ছুটিয়া আসিয়া পাতের কাছে রাখিয়া দিল।

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা, তুমিই বল, এতগুলো সন্দেশ এখন খেতে পারি?

বিরাজ মিষ্টান্নের পরিমাণ দেখিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল, গল্প কর্‌তে কর্‌তে অন্যমনস্ক হয়ে খাও—পারবে।

তবু খেতে হবে?

বিরাজ কহিল, হাঁ। হয় মাছ ছাড়তে পাবে না, না হয় এ জিনিসটা একটু বেশি ক'রে খেতেই হবে।

নীলাম্বর রেকাবটি টানিয়া লইয়া বলিল, তোর এই খাবার জুলুমের ভয়ে ইচ্ছে করে, বনে গিয়ে ব'সে থাকি।

পুঁটি বলিয়া উঠিল, আমাকেও দাদা—

বিরাজ ধমক দিয়া উঠিল, চুপ কর্‌ পোড়ারমুখি, খাবি নে ত বাঁচবি কি ক'রে? এই নালিশ করা বেরুবে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে।

২

মাস-দেড়েক পরে, পাঁচ দিন জ্বর-ভোগের পর আজ সকাল হইতে নীলাম্বরের জ্বর ছিল না। বিরাজ বাসি কাপড় ছাড়াইয়া, স্বহস্তে কাচা কাপড় পরাইয়া দিয়া, মেঝেয় বিছানা পাতিয়া শোয়াইয়া দিয়া গিয়াছিল। নীলাম্বর জানালার বাহিরে একটা নারিকেল বৃক্ষের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। ছোট বোন হরিমতি কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতেছিল। অনতিকাল পরেই স্নান করিয়া বিরাজ সিক্ত চুল পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া ঘরে ঢুকিল। সমস্ত ঘর যেন আলো হইয়া উঠিল। নীলাম্বর চাহিয়া দেখিয়া বলিল, ও কি ?

বিরাজ বলিল, যাই, বাবা পঞ্চানন্দের পূজো পাঠিয়ে দিই গে, বলিয়া শিয়রের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত দিয়া স্বামীর কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, না, জ্বর নেই। জানি নে এ বছর মার মনে কি আছে। ঘরে ঘরে কি কাণ্ড যে সুরু হয়েছে—আজ সকালে শুনলাম আমাদের মতি মোড়লের ছেলের সর্ব্বাঙ্গে মার অনুগ্রহ হয়েছে—দেহে তিল রাখবার স্থান নেই !

নীলাম্বর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মতির কোন্ ছেলের বসন্ত দেখা দিয়েছে ?

বড়ছেলের। মা শীতলা, গাঁ ঠাণ্ডা কর মা !—আহা, ঐ ছেলেই ওর রোজগারী। গেল শনিবারে শেষ রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে হঠাৎ তোমার গায়ে হাত পড়ায় দেখি, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। ভয়ে বুকের রক্ত কাঠ হয়ে গেল। উঠে ব'সে খানিকক্ষণ কাঁদলুম, তার পর মানস করলুম, মা শীতলা, ভাল যদি কর মা, তবেই ত তোমার পূজো দিয়ে আবার খাব দাব, না হ'লে

অনাহারে প্রাণত্যাগ করব। বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া দুফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

নীলাম্বর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুমি উপোস ক'রে আছ নাকি?

পুঁটি কহিল, হাঁ দাদা, কিছু খায় না বৌদি—কেবল সন্ধ্যেবেলায় এক মুঠো কাঁচা চাল আর এক ঘটি জল খেয়ে আছে—কারও কথা শোনে না।

নীলাম্বর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, এইগুলো তোমার পাগ্‌লামি নয়?

বিরাজ আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, পাগ্‌লামি নয়? আসল পাগ্‌লামি। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতে ত বুঝতে স্বামী কি বস্তু! তখন বুঝতে, এমন দিনে তার জ্বর হ'লে, বুকের ভিতরে কি করতে থাকে! বলিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, দাঁড়াইয়া বলিল, পুঁটি, ঝি পূজো নিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে যাস্ ত শীগ্‌গির ক'রে নেয়ে নি গে।

পুঁটি আহ্লাদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, যাব বৌদি।

তবে দেরি করিস্ নে, যা ঠাকুরের কাছে, তোর দাদার জন্যে বেশ ক'রে বর চেয়ে নিস্।

পুঁটি ছুটিয়া চলিয়া গেল। নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, সে ও পারবে, বরং তোমার চেয়ে ওই ভাল পারবে।

বিরাজ হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল। বলিল, তা মনে ক'রো না। ভাই বল আর বাপ-মা-ই বল, মেয়েমানুষের স্বামীর বড় আর কেউ নয়। ভাই বাপ-মা গেলে দুঃখ-কষ্ট খুবই হয়, কিন্তু স্বামী গেলে যে সর্ব্বস্ব যায়। এই যে পাঁচদিন না খেয়ে আছি, তা দুর্ভাবনার চাপে একবার মনে হয় নি যে, উপোস ক'রে আছি—কিন্তু কৈ, ডাক ত তোমার কোন্ বোনকে দেখি কেমন—

নীলাম্বর তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, আবার!

বিরাজ বলিল, তবে বল কেন ? পাগ্‌লামি করেচি কি—কি করেচি সে আমি জানি, আর যে দেবতা আমার মুখ রেখেচেন, তিনিই জানেন। আমি তা হ'লে একটি দিনও বাঁচ্‌তুম না, সিঁথের এ সিঁদুর তোলবার আগে সিঁথে পাথর দিয়ে ছেঁচে ফেলতুম। শুভযাত্রা ক'রে লোকে মুখ দেখবে না, শুভকর্ম্মে লোকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে না, এ দুটো শুধু হাত লোকের কাছে বার করতে পারব না, লজ্জায় এ মাথার আঁচল সরাতে পারব না, ছি ছি, সে বাঁচা কি আবার একটা বাঁচা ? সেকালে যে পুড়িয়ে মারা ছিল, সে ছিল ঠিক কাজ! পুরুষমানুষে তখন মেয়েমানুষের দুঃখ-কষ্ট বুঝ্‌তো ; এখন বোঝে না।

নীলাম্বর কহিল, যা না, তুই বুঝিয়ে দি গে।

বিরাজ বলিল, তা পারি! আর শুধু আমিই কেন, তোমাকে পেয়ে যে কেউ তোমাকে হারাবে, সেই বুঝিয়ে দিতে পারবে—আমি একলা নয়। যাক্, কি সব ব'কে যাচ্ছি, বলিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আর একবার স্বামীর বুকের উত্তাপ, কপালের উত্তাপ হাত দিয়া অনুভব করিয়া বলিল, গায়ে কোথাও ব্যথা নেই ত ?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

বিরাজ বলিল, তবে আর কোন ভয় নেই। আজ আমার ক্ষিদে পেয়েছে—যাই, এইবার দুটো রাঁধবার জোগাড় করি গে—সত্যি বল্‌চি তোমাকে, আজ কেউ যদি আমার একখানা হাত কেটে দেয়, তা হ'লেও বোধ করি রাগ হয় না।

যদু চাকর বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, মা, কবিরাজমশাইকে এখন ডেকে আনতে হবে কি ?

নীলাম্বর কহিল, না না, আর আবশ্যক নেই।

যদু তথাপি গৃহিণীর অনুমতির জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। বিরাজ তাহা

বেলা তখন প্রায় দুইটা, বাহিরের প্রচণ্ড রৌদ্রের দিকে চাহিয়া, সে শুধু-মাথায় পথে বাহির হইবার কথা ভাবিতেও পারিল না, হতাশ হইয়া ছোটবোনের হাত ধরিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। হরিমতি কিছুক্ষণ অনর্গল বকিতে বকিতে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। নীলাম্বর চুপ করিয়া মনে মনে নানারূপ আবৃত্তি করিয়া দেখিতে লাগিল, কথাটা ঠিক কি রকম করিয়া পাড়িতে পারিলে খুব সম্ভব বিরাজের করুণার উদ্রেক করিবে।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছিল। বিরাজ ঘরের শীতল মসৃণ সিমেণ্টের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বুকের তলায় একটা বালিশ দিয়া মগ্ন হইয়া মামা ও মামীকে চারপাতা জোড়া পত্র লিখিতেছিল। কি করিয়া এ বাড়ীতে শুদ্ধমাত্র মা শীতলার কৃপায় মরা বাঁচিয়াছে, কি করিয়া যে এ যাত্রা সিঁথির সিঁদুর ও হাতের নোয়া বজায় রহিয়া গিয়াছে, লিখিয়া লিখিয়া ক্রমাগত লিখিয়াও সে কাহিনী শেষ হইতেছিল না, এমন সময় খাটের উপর হইতে নীলাম্বর হঠাৎ ডাকিয়া বলিল, একটি কথা রাখ্‌বে বিরাজ?

বিরাজ দোয়াতের মধ্যে কলমটা ছাড়িয়া দিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, কি কথা?

যদি রাখ ত বলি।

বিরাজ কহিল, রাখ্‌বার মত হলেই রাখ্‌বো—কি কথা?

নীলাম্বর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, ব'লে লাভ নেই বিরাজ, তুমি কথা আমার রাখ্‌তে পার্‌বে না।

বিরাজ আর প্রশ্ন করিল না, কলমটা তুলিয়া লইয়া পত্রটা শেষ করিবার জন্য আর একবার ঝুঁকিয়া পড়িল; কিন্তু চিঠিতে মন দিতে পারিল না। ভিতরে ভিতরে কৌতূহলটা তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা বল, আমি কথা রাখ্‌ব।

নীলাম্বর একটুখানি হাসিল, একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, তাহার পরে

বলিল, দুপুর-বেলা মতি চাঁড়াল এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরেছিল। তাদের বিশ্বাস, আমার পায়ের ধুলো না পড়লে তার ছিমন্ত বাঁচবে না, আমাকে একবার যেতে হবে।

তাহার মুখপানে চাহিয়া বিরাজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, এই রোগা দেহ নিয়ে তুমি যাবে ?

কি কর্‌ব বিরাজ, কথা দিয়েছি, আমাকে একবার যেতেই হবে।

কথা দিলে কেন ?

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ কঠিনভাবে বলিল, তুমি কি মনে কর, তোমার প্রাণটা তোমার একলার, ওতে কারও কিছু বলবার নেই ? তুমি যা ইচ্ছে তাই কর্‌তে পার ?

নীলাম্বর কথাটা লঘু করিয়া ফেলিবার জন্য হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া তাহার হাসি আসিল না। কোনমতে বলিয়া ফেলিল, কিন্তু তার কান্না দেখলে—

বিরাজ কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, ঠিক ত! তার কান্না দেখলে—কিন্তু আমার কান্না দেখবার লোক সংসারে আছে কি! বলিয়া চারপাতা জোড়া চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিল, উঃ! পুরুষমানুষেরা কি! চার দিন চার রাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে কাটালুম—ও হাতে হাতে তার প্রতিফল দিতে চল্‌ল। ঘরে ঘরে জ্বর, ঘরে ঘরে বসন্ত—এই রোগা দেহ নিয়ে ও রোগী ঘাঁটতে চলল—আচ্ছা যাও, আমার ভগবান আছেন। বলিয়া আর একবার বালিশে বুক দিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

নীলাম্বরের ওষ্ঠাধরে অতি সূক্ষ্ম, অতি ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল ; ধীরে ধীরে বলিল, সে ভরসা কি তোদের আছে বিরাজ, যে কথায় কথায় ভগবানের দোহাই পাড়িস্‌!

বিরাজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া ক্রোধের স্বরে বলিল, না, ভগবানের উপর ভরসা শুধু তোমাদের একচেটে, আমাদের নয়। আমরা কীর্ত্তন গাই নে, তুলসীর মালা পরি নে, মড়া পোড়াই নে, তাই আমাদের নয়, একলা তোমাদের।

নীলাম্বর তাহার রাগ দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, রাগ করিস্ নে বিরাজ, সত্যিই তাই। তুই একা নয়—তোরা সবাই ওই! ভগবানের ওপর ভরসা ক'রে থাক্‌তে যতটা জোরের দরকার ততটা জোর মেয়ে-মানুষের দেহে থাকে না—তাতে তোর দোষ কি ?

বিরাজ আরও রাগিয়া বলিল, না, দোষ কেন, ওটা মেয়েমানুষের গুণ; কিন্তু গায়ের জোরের যদি এত দরকার ত বাঘ-ভালুকের গায়ে ত আরও জোর আছে। আর জোর থাক্ ভাল, না থাক্, ভাল, এই রোগা দেহ নিয়ে তোমাকে আমি আজ বার হ'তে দেব না—তা তুমি যত তর্কই কর না কেন ?

নীলাম্বর আর কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। বিরাজও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া, বেলা গেল—যাই, বলিয়া উঠিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে দীপ জ্বালিয়া ঘরে সন্ধ্যা দিতে আসিয়া দেখিল, স্বামী শয্যায় নাই। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাকিয়া বলিল, পুঁটি, তোর দাদা কই রে ? যা বাইরে দেখে আয় ত।

পুঁটি ছুটিয়া চলিয়া গেল, মিনিট-পাঁচেক পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কোথাও নেই—নদীর ধারেও না।

বিরাজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ। তার পরে রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

৩

বছর-তিনেক পরের কথা বলিতেছি। মাস-দুই পূর্ব্বে হরিমতি শ্বশুরঘর করিতে গিয়াছে; ছোটভাই পীতাম্বর এক বাটীতে থাকিয়াও পৃথগন্ন হইয়াছে। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় সন্ধ্যার ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সেইখানে নীলাম্বর একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বিরাজ নিঃশব্দে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নীলাম্বর চাহিয়া দেখিয়া বলিল, হঠাৎ বাইরে যে?

বিরাজ একধারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে এসেছি।

কি?

বিরাজ বলিল, কি খেলে মরণ হয়, ব'লে দিতে পার?

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, হয় ব'লে দাও, না হয় আমাকে খুলে বল, কেন এমন রোজ রোজ শুকিয়ে যাচ্ছ?

শুকিয়ে যাচ্ছি কে বল্‌লে?

বিরাজ চোখ তুলিয়া এক মুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তার পরে বলিল, হাঁ গা, কেউ বলে দেবে তার পর আমি জান্‌ব, এ কি সত্যি তোমার মনের কথা?

নীলাম্বর একটুখানি হাসিল। নিজের কথাটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, না রে, তা নয়। তবে তোর নাকি বড় ভুল হয় তাই জিজ্ঞেস কচ্চি, এ কি আর কেউ বলেচে, না নিজেই ঠিক করেচিস্?

বিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন বিবেচনা করিল না। বলিল, কত বললুম তোমাকে, পুঁটির আমার অমন জায়গায় বিয়ে দিও না—

কিছুতেই কথা শুনলে না। নগদ যা ছিল গেল, আমার গায়ের গহনাগুলো গেল, যদু মোড়লের দরুণ ডাঙ্গাটা বাঁধা পড়ল, দুখানা বাগান বিক্রি করলে, তার উপর এই দু'সন অজন্মা। বল আমাকে, কি ক'রে তুমি জামায়ের পড়ার খরচ মাসে মাসে যোগাবে? একটা কিছু হলেই পুঁটিকে খোঁটা সইতে হবে—সে আমার অভিমানী মেয়ে, কিছুতেই তোমার নিন্দে শুনতে পারবে না—শেষে কি হ'তে কি হবে, ভগবান জানেন—কেন তুমি এমন কাজ করলে?

নীলাম্বর মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, তা ছাড়া পুঁটির ভাল করতে গিয়ে দিনরাত ভেবে ভেবে শেষে তুমি কি আমার সর্ব্বনাশ করবে, সে হবে না। তার চেয়ে এক কাজ কর, দু'-পাঁচ বিঘে জমি বিক্রি ক'রে শ-পাঁচেক টাকা যোগাড় ক'রে গলায় কাপড় দিয়ে জামায়ের বাপকে বল গে, এই নিয়ে আমাদের রেহাই দিন মশাই, আমরা গরীব, আর পারব না! এতে ভাল-মন্দ পুঁটির অদৃষ্টে যা হয় হোক্।

তথাপি নীলাম্বর মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, পারবে না বলতে?

নীলাম্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, পারি, কিন্তু সবই যদি বিক্রি ক'রে ফেলি বিরাজ, আমাদের হবে কি?

বিরাজ বলিল, হবে আবার কি! বিষয় বাঁধা দিয়ে মহাজনের সুদ আর মুখনাড়া সহ্য করার চেয়ে এ ঢের ভাল। আমার একটা ছেলেপিলে নেই যে, তার জন্যে ভাবনা—আমরা দু'টো প্রাণী—যেমন ক'রে হোক্ চ'লে যাবেই। নিতান্ত না চলে, তুমি বোষ্টমঠাকুর ত আছই, আমি না হয় বোষ্টমী হয়ে পড়ব—দুজনে কাশী বৃন্দাবন ক'রে বেড়াব।

নীলাম্বর একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুই কি করবি, মন্দিরা বাজাবি?

হাঁ বাজাব। নেহাত না পারি তোমার ঝুলি ব'য়ে বেড়াতে পার্‌ব ত ? তোমার মুখের কৃষ্ণ নাম শুনে পশু-পক্ষী স্থির হয়ে দাঁড়ায়, আমাদের ছুটো প্রাণীর খাওয়া চলবে না ? চল, ঘরে চল, অন্ধকারে তোমার মুখ দেখতে পাচ্চি নে।

ঘরে আসিয়া বিরাজ স্বামীর মুখের কাছে প্রদীপ তুলিয়া আনিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া হাসি গোপন করিয়া বলিল, না, সাহস হয় না। এমন বোষ্টমকে আর পাঁচজন বোষ্টমীর সামনে প্রাণ ধরে বার করতে পারব না—তার চেয়ে এখানে শুকিয়ে মরি সে ভাল।

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, ওরে সেখানে শুধু বোষ্টমীই থাকে না, বোষ্টমও থাকে।

বিরাজ বলিল, তা থাক্। একজন ছুজন কেন, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ থাক্, বলিয়া প্রদীপটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, আচ্ছা শুনি, সংসারে সতী অসতী ছুই-ই আছে—অসতী মেয়েমানুষ কখন চোখে দেখি নি—আমার বড় সাধ হয় দেখতে, তারা কি রকম। ঠিক আমাদের মত, না আর কোন রকম! তারা কি করে, কি ভাবে, কি খায়, কেমন ক'রে শুয়ে ঘুমায়—এ সব আমার দেখতে ইচ্ছে করে—আচ্ছা, তুমি দেখেচ ?

নীলাম্বর বলিল, দেখেচি!

দেখেচ ? আচ্ছা, এই আমি যেমন ব'সে কথা কইচি, তারা কি এম্‌নি ক'রে ব'সে যার তার সঙ্গে কথা কয় ?

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, তা বল্‌তে পারি নে—আমি ততটা দেখি নি।

বিরাজ ক্ষণকাল নির্নিমেষ চোখে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া তাহার সর্ব্বশরীর বারংবার শিহরিয়া উঠিল!

নীলাম্বর দেখিতে পাইয়া বলিল, ও কি রে?

বিরাজ বলিল, উঃ—কি, তারা! দুর্গা! দুর্গা! সন্ধ্যেবেলা কি কথা উঠে পড়ল—কৈ সন্ধ্যে করলে না?

নীলাম্বর বলিল, এই উঠি।

হাঁ যাও, হাত-পা ধুয়ে এস, আমি এই ঘরেই আসন পেতে ঠাঁই ক'রে দিচ্চি।

দিন পাঁচ-ছয় পরে রাত্রি দশটার সময় নীলাম্বর বিছানায় শুইয়া চোখ বুজিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া ধূমপান করিতেছিল। বিরাজ সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া শুইবার পূর্ব্বে মেঝেয় বসিয়া নিজের জন্য খুব বড় করিয়া একটা পান সাজিতে সাজিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা শাস্তরের কথা কি সমস্ত সত্যি?

নীলাম্বর নলটা একপাশে রাখিয়া স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, শাস্ত্রের কথা সত্যি নয় ত কি মিথ্যে?

বিরাজ বলিল, না, মিথ্যে বল্‌চি নে, কিন্তু সেকালের মত একালেও কি সব ফলে?

নীলাম্বর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, আমি পণ্ডিত নয় বিরাজ, সব কথা জানি নে, কিন্তু আমার মনে হয়, যা সত্যি, তা সেকালেও সত্যি, একালেও সত্যি।

বিরাজ বলিল, আচ্ছা মনে কর সাবিত্রী-সত্যবানের কথা। মরা স্বামীকে সে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিল, একি সত্যি হ'তে পারে?

নীলাম্বর বলিল, কেন পারে না? যিনি তাঁর মত সতী, তিনি নিশ্চয়ই পারেন।

তা হ'লে আমিও ত পারি?

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, তুই কি তাঁর মত সতী না কি? তাঁরা হলেন দেবতা।

বিরাজ পানের বাটাটা এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিল, হলেনই বা দেবতা! সতীত্বে আমিই বা তাঁর চেয়ে কম কিসে? আমার মত সতী সংসারে আরও থাকতে পারে, কিন্তু মনে জ্ঞানে আমার চেয়ে বড় সতী আর কেউ আছে, এ কথা মানি নে। আমি কারও চেয়ে একতিল কম নই, তা তিনি সাবিত্রীই হন আর যেই হন।

নীলাম্বর জবাব দিল না, তাহার মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। বিরাজ প্রদীপ সুমুখে আনিয়া পান সাজিতেছিল, তাহার মুখের উপর সমস্ত আলোটাই পড়িয়াছিল, সেই আলোকে নীলাম্বর স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কি এক রকমের আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ বিরাজের দুই চোখের ভিতর হইতে ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে। নীলাম্বর কতকটা ভয়ে ভয়ে বলিয়া ফেলিল, তা হ'লে তুমিও পার্‌বে বোধ হয়।

বিরাজ উঠিয়া আসিয়া হেঁট হইয়া স্বামীর দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, এই আশীর্ব্বাদ কর, যদি জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত এই দুটি পা ছাড়া সংসারে আর কিছু না জেনে থাকি, যদি যথার্থ সতী হই, তবে যেন অসময়ে তাঁর মতই তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পারি—তার পরে, এই পায়ে মাথা রেখে যেন মরি—যেন এই সিঁদুর, এই নোয়া নিয়েই চিতায় শুতে পাই।

নীলাম্বর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি হয়েছে রে বিরাজ, আজ?

বিরাজের দুই চোখে জল টল্‌ টল্‌ করিতেছিল, তৎসত্ত্বেও তাহার ওষ্ঠাধরে অতি মৃদু মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, আর একদিন শুনো, আজ নয়। আজ শুধু আশীর্ব্বাদ কর, মরণকালে যেন এই দুই পায়ের ধূলো পাই, যেন তোমার কোলে মাথা রেখে তোমার মুখের পানে চেয়ে মরতে পারি।

সে আর বলিতে পারিল না। এইবার তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

নীলাম্বর ভয় পাইয়া তাহাকে জোর করিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, কি হয়েছে রে আজ? কেউ কিছু বলেছে কি?

বিরাজ স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল; জবাব দিল না।

নীলাম্বর পুনরায় কহিল, কোন দিন ত তুই এমন করিস্ নি বিরাজ, কি হয়েচে বল্।

বিরাজ গোপনে চক্ষু মুছিল, কিন্তু মুখ তুলিল না, মৃদুকণ্ঠে বলিল, আর একদিন শুনো।

নীলাম্বর আজ পীড়াপীড়ি করিল না, তেমনই ভাবে বসিয়া থাকিয়া তাহার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিয়া নিঃশব্দে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সে ক্ষমতার অতিরিক্ত খরচপত্র করিয়া ভগিনীর বিবাহ দিয়া কিছু জড়াইয়া পড়িয়াছিল। সংসারে আর পূর্ব্বের সচ্ছলতা ছিল না। উপর্য্যপরি দুই সন অজন্মা। গোলায় ধান নাই, পুকুরে জল নাই, মাছ নাই, কলা বাগান শুকাইয়া উঠিতেছে, লেবু বাগানের কাঁচালেবু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার উপর উত্তমর্ণেরা আসা যাওয়া সুরু করিয়াছিল এবং পুঁটির শ্বশুরও ছেলের পড়াশুনার খরচের জন্য মিঠে-কড়া চিঠি পাঠাইতে-ছিলেন। এত কথা বিরাজ জানিত না। অনেক অপ্রীতিকর সংবাদই নীলাম্বর প্রাণপণে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এখন সে উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল, বুঝি এই সমস্ত কথাই কেহ বিরাজকে শুনাইয়া গিয়াছে।

সহসা বিরাজ মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিল; কহিল, একটি কথা জিজ্ঞেস কর্‌ব, সত্যি জবাব দেবে?

নীলাম্বর মনে মনে অধিকতর শঙ্কিত হইয়া বলিল, কি কথা?

বিরাজের সমস্ত সৌন্দর্য্যের বড় সৌন্দর্য্য ছিল তাহার মুখের হাসি। সে সেই হাসি আর একবার হাসিয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, আমি কাল-কুচ্ছিত নই ত?

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

যদি কাল-কুচ্ছিত হতুম, তা হ'লে আমাকে কি এত ভালবাস্‌তে?

এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া যদিও সে কিছু বিস্মিত হইল, তথাপি একটা গুরুতর ভার তার বুকের উপর হইতে যেন সহসা গড়াইয়া পড়িয়া গেল।

সে খুসি হইয়া হাসিয়া বলিল, ছেলে-বেলা থেকে একটি পরমাসুন্দরী-কেই ভালবেসে এসেচি—কি ক'রে বল্‌ব এখন, সে কাল-কুচ্ছিত হ'লে কি করতুম?

বিরাজ দুই বাঁহু দ্বারা স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আরও সন্নিকটে মুখ আনিয়া কহিল, আমি বল্‌ব কি কর্‌তে? তা হ'লেও তুমি আমাকে এমনই ভালবাসতে!

তথাপি নীলাম্বর নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, তুমি ভাব্‌ছ কি ক'রে জানলুম—না?

এবার নীলাম্বর আস্তে আস্তে বলিল, ঠিক তাই ভাবছি—কি ক'রে জান্‌লে?

বিরাজ গলা ছাড়িয়া দিয়া বুকের একধারে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া উপর দিকে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার মন ব'লে দেয়। আমি তোমাকে যত চিনি, তুমি নিজেও নিজেকে তত চেন না, তাই জানি, আমাকে তুমি এমনই ভালবাসতে। যা অন্যায়, যাতে পাপ হয়, এমন কাজ তুমি কখনও করতে পার না—স্ত্রীকে ভাল না বাসা অন্যায়, তাই আমি জানি, যদি আমি কাণা খোঁড়াও হতুম, তবুও তোমার কাছে এমনই আদর পেতুম।

নীলাম্বর জবাব দিল না।

বিরাজ এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া সহসা হাত বাড়াইয়া আন্দাজ করিয়া স্বামীর চোখের কোণে অঙ্গুলি দিয়া বলিল, জল কেন?

নীলাম্বর তাহার হাতটি সযত্নে সরাইয়া দিয়া ভারী গলায় বলিল, জান্‌লে কি ক'রে ?

বিরাজ বলিল, ভুলে যাও কেন যে, আমার নবছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ? ভুলে যাও কেন যে, তোমাকে পেয়ে তবে আমি তোমাকে পেয়েছি ? নিজের গায়ে হাত দিয়েও কি টের পাও না যে, আমিও ঐ সঙ্গে মিশে আছি ?

নীলাম্বর কথা কহিল না। আবার তাহার নিমীলিত চোখের দুই কোণ বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিরাজ উঠিয়া বসিয়া আঁচল দিয়া তাহা সযত্নে মুছাইয়া দিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, ভেব না, মা মরণকালে তোমার হাতে পুঁটিকে দিয়ে গিয়েছেন, সেই পুঁটির ভাল হবে বলে যা ভাল বুঝেছ তাই করেছ—স্বর্গে থেকে মা আমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন। তুমি শুধু এখন সুস্থ হও, ঋণমুক্ত হও—যদি সর্ব্বস্ব যায় তাও যাক।

নীলাম্বর চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধস্বরে কহিল, তুই জানিস্ নে বিরাজ, আমি কি করেছি—আমি তোর—

বিরাজ বলিতে দিল না। মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, সব জানি আমি। আর জানি, না জানি, ভেবে ভেবে তোমাকে আমি রোগা হ'তে দিতে যে পারব না, সেটা নিশ্চয় জানি। না, সে হবে না—যার যা পাওনা দিয়ে দাও, দিয়ে নিশ্চিন্ত হও, তার পরে মাথার উপর ভগবান আছেন, পায়ের নিচে আমি আছি।

নীলাম্বর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

৪

আরও ছয় মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। হরিমতির বিবাহের পূর্ব্বেই ছোটভাই বিষয় সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিল। নীলাম্বরের নিজের ভাগে যাহা পড়িয়াছিল তাহার কিয়দংশ সেই সময়েই বাঁধা দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল—বলা বাহুল্য, পীতাম্বর এক কপর্দ্দক দিয়াও সাহায্য করে নাই। অবশিষ্ট জমি-জমা যাহা ছিল, তাহাই একটির পর একটি বন্ধক দিয়া নীলাম্বর বিবাহের সর্ত্ত পালন করিয়া ভগিনীপতির পড়ার খরচ যোগাইতে লাগিল এবং সংসার চালাইতে লাগিল। এইরূপে দিন দিন নিজেকে সে ক্রমাগত শক্ত করিয়া জড়াইয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু মমতা-বশে কোন মতেই পৈতৃক-সম্পত্তি একেবারে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিল না। আজ বৈকালে ও-পাড়ার ভোলানাথ মুখুয্যে আসিয়া বাকি সুদের জন্য কয়েকটা কথা কড়া করিয়াই বলিয়া গিয়াছিল, আড়ালে দাঁড়াইয়া বিরাজ তাহা সমস্তই শুনিল এবং নীলাম্বর ঘরে আসিতেই, সে রান্না-ঘর হইতে নিঃশব্দে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের পানে চাহিয়া নীলাম্বর মনে মনে প্রমাদ গণিল। ক্ষোভে অপমানে বিরাজের বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া জ্বলিতেছিল; কিন্তু সে ভাব সে সংযত করিয়া হাত দিয়া খাট দেখাইয়া দিয়া প্রশান্ত-গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, ঐখানে ব'স।

নীলাম্বর শয্যার উপর বসিতেই সে নিচে পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া

বলিল, হয় আমাকে ঋণমুক্ত কর, না হয় আজ তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর্‌ব।

নীলাম্বর বুঝিল, সে সমস্ত শুনিয়াছে, তাই অত্যন্ত ভয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া তুলিয়া পাশে বসাইয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিল, ছি বিরাজ, সামান্যতেই আত্ম-হারা হ'স নে।

বিরাজ মুখের উপর হইতে তাহার হাতটা সরাইয়া দিয়া বলিল, এতেও মানুষ আত্মহারা না হয় ত কিসে হয় বল শুনি।

নীলাম্বর কি জবাব দিবে, হঠাৎ খুঁজিয়া পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, চুপ ক'রে রইলে কেন? জবাব দাও।

নীলাম্বর মৃদু-কণ্ঠে বলিল, জবাব দেবার কিছুই নেই বিরাজ, কিন্তু—

বিরাজ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না, কিছুতে হবে না। আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে লোকে তোমাকে অপমান ক'রে যাবে, কানে শুনে আমি সহ্য ক'রে থাক্‌ব—এ ভরসা মনে ঠাঁই দিও না। হয় তার উপায় কর, না হয় আমি আত্মঘাতী হব।

নীলাম্বর ভয়ে ভয়ে কহিল, এক দিনেই কি উপায় করব বিরাজ?

বেশ, দুদিন পরে কি উপায় কর্‌বে, তাই আমাকে বুঝিয়ে বল।

নীলাম্বর পুনরায় মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, একটা অসম্ভব আশা ক'রে নিজেকে ভুল বুঝিয়ো না—আমার সর্ব্বনাশ ক'রো না। যত দিন যাবে, ততই বেশি জড়িয়ে পড়বে, দোহাই তোমার, আমি ভিক্ষে চাইচি, তোমার দুটি পায়ে ধরচি, এই বেলা যা হয় একটা পথ কর। বলিতে বলিতে তাহার অশ্রুভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। ভুলু মুখুয্যের কথাগুলো তাহার বুকের ভিতরে শূল হানিতে লাগিল। নীলাম্বর হাত দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে

বলিল, অধীর হ'লে কি হবে বিরাজ? একটা বছর যদি ষোল আনা ফসল পাই, বার আনা বিষয় উদ্ধার ক'রে নিতে পার্‌ব; কিন্তু বিক্রি ক'রে ফেল্‌লে আর ত হবে না, সেটা ভেবে দেখ।

বিরাজ আর্দ্রস্বরে বলিল, দেখেচি। আস্‌চে বছরেই ষোল আনা ফসল পাবে, তারই বা ঠিকানা কি? তার ওপর সুদ আছে, লোকের গঞ্জনা আছে। আমি সব সইতে পারি, কিন্তু তোমার অপমান ত সইতে পারি নে!

নীলাম্বর নিজে তাহা বেশ জানিত, তাই কথা কহিতে পারিল না।

বিরাজ পুনরায় কহিল, শুধু এই কি আমার সমস্ত দুঃখ? দিবারাত্রি ভেবে ভেবে তুমি আমার চোখের সাম্‌নে শুকিয়ে উঠ্‌চ, এমন সোনার মূর্ত্তি কালি হয়ে যাচ্চে! আচ্ছা, আমার গা ছুঁয়ে তুমিই বল, এও সহ্য করবার ক্ষমতা কি আমার আছে? আর কতদিন যোগীনের পড়ার খরচ যোগাতে হবে?

আরও একটা বছর। তা হ'লেই সে ডাক্তার হ'তে পারবে।

বিরাজ এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, পুঁটিকে মানুষ ক'রেচি, সে আমার রাজরাণী হ'ক্‌, কিন্তু সে হ'তে আমার এতটা দুঃখ ঘটবে জান্‌লে, ছোট-বেলায় তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিতুম। এমন ক'রে নিজের মাথায় বাজ হান্‌তুম না! হা ভগবান! বড়লোক তারা, কোন কষ্ট, কোন অভাব নেই, তবুও জোঁকের মত আমার বুকের রক্ত শুষে নিতে তাদের এতটুকুও দয়া মায়া হচ্চে না! বলিয়া একটা সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিবার পরে বিরাজ মুখ তুলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, চারিদিকে অভাব, চারিদিকে আকাল, গরীব দুঃখীরা ত এরই মধ্যে কেউ উপোষ, কেউ একবেলা খেতে সুরু করেচে, এমন দুঃসময়েও আমরা পরের ছেলে মানুষ করব কেন? পুঁটির শ্বশুরের অভাব নেই, সে বড়লোক; সে যদি নিজের ছেলেকে না পড়াতে

দেখিতে পাইয়া বলিল, না, যা ডেকে নিয়ে আয়, একবার ভাল ক'রে দেখে যান।

দিন-তিনেক পরে আরোগ্য লাভ করিয়া নীলাম্বর বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াছিল, মতি মোড়ল আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—দাঠাকুর, তুমি একবার না দেখ্‌লে ত আমার ছিমন্ত আর বাঁচে না। একবার পায়ের ধুলো দাও দেব্‌তা, তা হ'লে যদি এ যাত্রা সে বেঁচে—আর সে বলিতে পারিল না—আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।

নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিল, গায়ে কি খুব বেরিয়েচে মতি?

মতি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিতে লাগিল, সে আর কি বল্‌ব! মা যেন একেবারে ঢেলে দিয়েছেন। ছোটজাত হয়ে জন্মেছি ঠাকুরদা, কিছুই ত জানি নি; কি করতে হয়—একবার চল, বলিয়া সে দু'পা জড়াইয়া ধরিল।

নীলাম্বর ধীরে ধীরে পা ছাড়াইয়া লইয়া কোমলস্বরে বলিল, কিছু ভয় নেই মতি, তুই যা, আমি পরে যাব!

তাহার কান্নাকাটির কাছে সে নিজের অসুখের কথা বলিতে পারিল না। বিশেষ, সকল রকম রোগের সেবা করিয়া এ বিষয়ে তাহার এত অধিক দক্ষতা জন্মিয়াছিল যে, আশেপাশের গ্রামের মধ্যে কাহারও শক্ত অসুখ-বিসুখে তাহাকে একবার না দেখাইয়া, তাহার মুখের আশ্বাসবাক্য না শুনিয়া রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা কিছুতেই ভরসা পাইত না। নীলাম্বর এ কথা নিজেও জানিত। ডাক্তার-কবিরাজের ঔষধের চেয়ে, দেশের অশিক্ষিত লোকের দল, তাহার পায়ের ধূলা, তাহার হাতের জলপড়াকে অধিক শ্রদ্ধা করে, ইহা সে বুঝিত বলিয়াই কাহাকেও কোন দিন ফিরাইয়া দিতে পারিত না; মতি চাঁড়াল আর একবার কাঁদিয়া, আর একবার পায়ের ধূলার দাবী জানাইয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল; নীলাম্বর উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে

লাগিল। তাহার দেহ তখনও ঈষৎ দুর্ব্বল ছিল বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়। সে ভাবিতে লাগিল, বাড়ীর বাহির হইবে কি করিয়া? বিরাজকে সে অত্যন্ত ভয় করিত, তাহার কাছে এ কথা সে মুখে আনিবে কি করিয়া?

ঠিক এই সময়ে ভিতরের উঠান হইতে হরিমতির সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের ডাক আসিল, দাদা, বৌ'দি ঘরে এসে শুতে বল্‌চে।

নীলাম্বর জবাব দিল না।

মিনিট-খানেক পরেই হরিমতি নিজে আসিয়া হাজির হইল। বলিল, শুনতে পাও নি দাদা?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরিমতি কহিল, সেই চারটি খেয়ে পর্য্যন্ত ব'সে আছ, বৌদি বল্‌চে, আর ব'সে থাকতে হবে না একটু শোও গে।

নীলাম্বর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, সে কি কর্‌চে রে পুঁটি?

হরিমতি কহিল, এইবার ভাত খেতে বসেচে।

নীলাম্বর আদর করিয়া বলিল, লক্ষ্মী দিদি আমার, একটি কাজ কর্‌বি?

পুঁটি মাথা নাড়িয়া বলিল, কর্‌ব।

নীলাম্বর কণ্ঠস্বর আরও কোমল করিয়া কহিল, আস্তে আস্তে আমার চাদর আর ছাতিটা নিয়ে আয় দেখি।

চাদর আর ছাতি?

নীলাম্বর কহিল, হুঁ।

হরিমতি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ্‌ রে! বৌদি ঠিক এই দিকে মুখ ক'রে খেতে বসেছে যে!

নীলাম্বর শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, পার্‌বি নে আন্‌তে?

হরিমতি অধর প্রসারিত করিয়া দুই-তিন বার মাথা নাড়িয়া বলিল, না দাদা, দেখে ফেল্‌বে। তুমি শোবে চল।

পারে, আমরা পড়াব কেন? যা হয়েচে, তা হয়েচে, তুমি আর ধার করতে পাবে না।

নীলাম্বর অতি কষ্টে শুষ্ক হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে টানিয়া আনিয়া বলিল, সব বুঝি বিরাজ, কিন্তু শালগ্রাম সুমুখে রেখে শপথ করেচি যে! তার কি হবে?

বিরাজ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, কিছু হবে না। শালগ্রাম যদি সত্যিকারের দেবতা হন, তিনি আমার কষ্ট বুঝ্‌বেন। আর আমি ত তোমারই অর্দ্ধেক, যদি কিছু এতে পাপ হয়, আমি আমার নিজের মাথায় নিয়ে জন্ম জন্ম নরকে ডুবে থাকব; তোমার কিছু ভয় নেই, তুমি আর ঋণ ক'রো না।

ধর্ম্মপ্রাণ স্বামীর অন্তরের নিদারুণ দুঃখের লেশমাত্রও তাহার অগোচর ছিল না, কিন্তু সে আর সহিতে পারিতেছিল না। যথার্থ-ই স্বামী তাহার সর্ব্বস্ব ছিল। সেই স্বামীর অহর্নিশ চিন্তাক্লিষ্ট শুষ্ক অবসন্ন মুখের পানে চাহিয়া তাহার বুক ফাটিতেছিল। এতক্ষণ কোন মতে সে কান্না চাপিয়া কথা কহিতেছিল, আর পারিল না। সবেগে স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলাম্বর তাহার দক্ষিণ হস্ত বিরাজের মাথার উপরে রাখিয়া নির্ব্বাক্ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ কান্নার পরে তাহার দুঃখের দুঃসহ তীব্রতা মন্দীভূত হইয়া আসিলে, সে তেমনই মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ছেলে-বেলা থেকে যতদূর আমার মনে পড়ে, কোন দিন তোমার মুখ শুক্‌নো দেখিনি, কোন দিন তোমায় মুখ ভার কর্‌তে দেখি নি; এখন তোমার পানে চাইলেই আমার বুকের মধ্যে রাবণের চিতা জ্বলতে থাকে! তুমি নিজের পানে না চাও, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ! সত্যই কি শেষকালে আমাকে পথের ভিখারী কর্‌বে? সে কি তুমিই সইতে পারবে?

নীলাম্বর তথাপি উত্তর দিতে পারিল না, অন্যমনস্কের মত তাহার

চুলগুলি লইয়া ধীরে ধীরে নাড়িতে লাগিল। এমনি সময়ে দ্বারের বাহিরে পুরানো ঝি সুন্দরী ডাকিয়া বলিল, বৌমা, উনুন জ্বেলে দেব কি?

বিরাজ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুন্দরী পুনরায় কহিল, উনুন জ্বেলে দেব?

বিরাজ অস্পষ্টস্বরে বলিল, দে, তোদের জন্যে রাঁধতে হবে, আমি আর কিছু খাব না।

ঝি বড় গলায় নীলাম্বরকে শুনাইয়া বলিল, তুমি কি মা, তবে রাত্তিরে খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে! না খেয়ে খেয়ে যে একেবারে আধখানি হয়ে গেলে?

বিরাজ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া রান্নাঘরের দিকে লইয়া গেল।

জ্বলন্ত উনুনের আলো বিরাজের মুখের উপর পড়িয়াছিল। অদূরে বসিয়া সুন্দরী হাঁ করিযা সেই দিকে চাহিয়াছিল। হঠাৎ বলিল, সত্যি কথা মা, তোমার মত রূপ আমি মানুষের কখনও দেখি নি; এত রূপ রাজা-রাজড়ার ঘরেও নেই।

বিরাজ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ বিরক্ত ভাবে বলিল, তুই রাজা-রাজড়ার ঘরের খবর রাখিস্?

সুন্দরীর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রূপসী বলিয়া তাহারও এক সময়ে খ্যাতি ছিল, সে খ্যাতি আজিও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই।

সে বলিত, কবে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কবে বিধবা হইয়াছিল, কিছুই মনে পড়ে না, কিন্তু সধবার সৌভাগ্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হয নাই। তাহাদের গ্রাম কৃষ্ণপুরে এ সুখ্যাতিও তাহার ছিল। এখন হাসিয়া বলিল, রাজা-রাজড়ার ঘরের খবর কতকটা রাখি বৈ কি মা! না হ'লে সেদিন তাকে ঝাঁটা-পেটা করতুম!

এবার বিরাজ রীতিমত রাগ করিল; বলিল, তুই যখন তখন ঐ

কথাই বলিস্ কেন সুন্দরী? তাদের যা খুসি বলেচে, তাতে বা ঝাঁটা-পেটা কর্‌বি কেন? আর আমাকেই বা নাহক শোনাবি কেন? উনি রাগী মানুষ, শুন্‌লে কি বল্‌বেন বল্ ত?

সুন্দরী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, বাবু শুন্‌বেন কেন মা? এও কি একটা কথার মত কথা?

কথার মত কথা নয়, সে কথা তুই আমাকে বুঝিয়ে বল্‌বি? তা ছাড়া যা হয়ে বয়ে চুকে শেষ হয়ে গেছে, সে কথা তোলবার দরকারই বা কি?

সুন্দরী থপ্ করিয়া বলিল, কোথায় চুকে বুকে শেষ হয়েছে মা? কালও যে আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে—

বিরাজ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, তুই গেলি কেন? তুই আমার কাছে চাকরী কর্‌বি আর যে ডাকবে তার কাছে ছুটে যাবি? তুই নিজে না সেদিন বল্‌লি, সেদিন তাঁরা সব কলকাতায় চ'লে গেছেন?

সুন্দরী বলিল, সত্যি কথাই বলেছিলুম মা? মাস-দুই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন, আবার দেখচি সব এসেছেন। আর যাবার কথা যদি বল্‌লে মা, পিয়াদা ডাক্‌তে এলে, না বলি কি ক'রে? তাঁরা এ মুল্লুকের জমিদার, আমরা দুঃখী প্রজা—হুকুম অমান্য করি কি ভরসায়?

বিরাজ ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তাঁরা এ মুল্লুকের জমিদার নাকি?

সুন্দরী সহাস্যে বলিল, হাঁ মা, এ মহালটা তাঁরাই কিনেচেন,—বাবু তাঁবু খাটিয়ে আছেন—তা সত্যি মা, রাজপুত্তুর ত রাজপুত্তুর! কিবা মুখ-চোখের—

বিরাজ সহসা থামাইয়া দিয়া বলিল, থাম্ থাম্, চুপ কর্। ওসব তোকে জিজ্ঞেস করি নি—কি তোকে বল্‌লে, তাই বল্!

সুন্দরী এবার মনে মনে বিরক্ত হইল; কিন্তু সে ভাব গোপন

করিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, কি কথা আর হবে মা, কেবল তোমারই কথা!

হুঁ, বলিয়া বিরাজ চুপ করিয়া রহিল।

এইবার কথাটা বুঝাইয়া বলি। বছর-দুই পূর্ব্বে এই মহালটা কলিকাতার এক জমিদারের হস্তগত হয়; তাঁহার ছোটছেলে রাজেন্দ্রকুমার অতিশয় অসচ্চরিত্র এবং দুর্দ্দান্ত। পিতা তাহাকে কাজকর্ম্মে কতকটা শিক্ষিত ও সংযত করিতে এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করিবার অভিপ্রায়েই কাছাকাছি কোন একটা মহালে প্রেরণ করিতে চাহেন। গত বৎসর সে এইখানে আসে। রীতিমত কাছারীবাটী না থাকায়, সে সপ্তগ্রামের পর-পারে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটা আমবাগানে তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতেছিল। আসিয়া অবধি একটি দিনের জন্যও সে কাজকর্ম্ম শিখিবার ধার দিয়া চলে নাই। পাখী শিকার করিতে ভালবাসিত, হুইস্কির ফ্লাস্ক পিঠে বাঁধিয়া বন্দুক ও চার-পাঁচটা কুকুর লইয়া সমস্ত দিন নদীর ধারে বনে বনে পাখী মারিয়া বেড়াইত। এই অবস্থায় মাস-ছয়েক পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোধূলির স্বর্ণাভামণ্ডিত সিক্তবসনা বিরাজের উপর তাহার চক্ষু পড়ে। বিরাজের এই ঘাটটি চারিদিকে বড় বড় গাছে আবৃত থাকায় কোন দিক হইতে দেখা যাইত না; বিরাজ নিঃশঙ্কচিত্তে গা ধুইয়া পূর্ণ কলস তুলিয়া লইয়া উপর দিকে চক্ষু তুলিতেই এই অপরিচিত লোকটির সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল। রাজেন্দ্র পাখীর সন্ধান করিতে করিতে এদিকে আসিয়াছিল, অদূরস্থিত সমাধিস্তূপের উপরে দাঁড়াইয়া সে বিরাজকে দেখিল। মানুষের এত রূপ হয়, সহসা এ কথাটা যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিল না; কিন্তু আর সে চোখ ফিরাইতে পারিল না। অপলক দৃষ্টিতে চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই অতুল্য অপরিসীম রূপরাশি মগ্ন হইয়া পান করিতে লাগিল। বিরাজ আর্দ্র বসনে কোনমতে

লজ্জানিবারণ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল, রাজেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে গেল, কেমন করিয়া এমন সম্ভব হইল। এই অরণ্য-পরিবৃত ভদ্র সমাজ পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ের মধ্যে এত রূপ কেমন করিয়া কি করিয়া আসিল। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ীর পরিচয় সে সন্ধান করিয়া সেই রাত্রেই জানিয়া লইল এবং তখন হইতেই এই একমাত্র চিন্তা ব্যতীত তাহার আর দ্বিতীয় চিন্তা রহিল না। ইহার পর আরও দুইবার বিরাজের চোখে চোখে পড়িয়াছিল।

বিরাজ বাড়ীতে আসিয়া সুন্দরীকে ডাকিয়া বলিল, যা ত সুন্দরী, ঘাটের ধারে কে একটা লোক পরিস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, মানা ক'রে দি গে, যেন আর কোন দিন আমাদের বাগানে না ঢোকে।

সুন্দরী মানা করিতে আসিল, কিন্তু নিকটে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া বলিল, বাবু আপনি।

রাজেন্দ্র সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমাকে চেন নাকি?

সুন্দরী বলিল, আজ্ঞে হাঁ বাবু, আপনাকে আর কে না চেনে?

আমি কোথায় থাকি, জান?

সুন্দরী কহিল, জানি।

রাজেন্দ্র বলিল, আজ একবার ওখানে আস্‌তে পার?

সুন্দরী সলজ্জ হাস্যে মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাবু?

দরকার আছে, একবার যেও বলিয়া রাজেন্দ্র বন্দুক কাঁধে তুলিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পরে অনেকবার সুন্দরী গোপনে, নিভৃতে ওপারের জমিদারী কাছারীতে গিয়াছে, অনেক কথা কহিয়াছে, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া

এক-আধটু ইঙ্গিত ভিন্ন কোন কথা বিরাজের সামনে উত্থাপন করিতে সাহস করে নাই। সুন্দরী নির্ব্বোধ ছিল না ; সে বিরাজ-বৌকে চিনিত। বাহির হইতে এই বধূটিকে যতই মধুর এবং কোমল দেখাক্ না কেন, ভিতরের প্রকৃতি যে তাহার উগ্র এবং পাথরের মত কঠিন ছিল, সুন্দরী তাহা ঠিক জানিত। বিরাজের দেহে আরও একটা বস্তু ছিল, সে তাহার অপরিমেয় সাহস। তা সে মানুষই হ'ক, আর সাপ-খোপ ভূত-প্রেতই হ'ক, ভয় কাহাকে বলে তাহা সে একেবারেই জানিত না। সুন্দরী কতকটা সে কারণেও এতদিন আর তাহার মুখ খুলিতে পারে নাই।

বিরাজ উনুনের কাঠটা ঠেলিয়া দিয়া ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, আচ্ছা সুন্দরী, তুই ত অনেকবার সেখানে গিয়েছিস্, এসেছিস্, অনেক কথাও কয়েছিস্, কিন্তু আমাকে ত একটি কথাও বলিস্‌নি ?

সুন্দরী প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া কহিল, কে তোমাকে বললে মা, আমি অনেক কথা কয়ে এসেচি ?

বিরাজ বলিল, কেউ বলে নি, আমি নিজেই জানি। আমাদের কপালের পেছনে আরও দুটো চোখ-কান আছে। বলি, কাল ক'টাকা বক্‌শিস্ নিয়ে এলি ! দশ টাকা ?

সুন্দরী বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। তাহার মুখের উপরে একটা পাণ্ডুর ছায়া পড়িল, উনুনের অস্পষ্ট আলোকেও বিরাজ তাহা দেখিল এবং সে যে কথা খুঁজিয়া পাইতেছে না, তাহাও বুঝিল।

ঈষৎ হাসিয়া বলিল, সুন্দরী, তোর বুকের পাটা এত বড় হবে না যে, তুই আমার কাছে মুখ খুলবি ; কিন্তু কেন মিছে আনা-গোনা ক'রে টাকা খেয়ে শেষে বড়লোকের কোপে পড়্‌বি ? কাল থেকে এ বাড়ীতে আর ঢুকিস্ নে। তোর হাতের জল পায়ে ঢাল্‌তেও আমার ঘেন্না করে। এতদিন তোর সব কথা জানতুম না, দুদিন আগে তাও শুনেছি ; কিন্তু যা, আঁচলে

যে দশ টাকার নোট বাঁধা আছে, ফিরিয়ে দি গে, দিয়ে দুঃখী মানুষ দুঃখ-ধান্দা করে খা গে। নিজে বয়সকালে যা করেছিস্, সে ত আর ফিরবে না, কিন্তু আর পাঁচজনের সর্ব্বনাশ করতে যাস্ নে।

সুন্দরী কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার জিভ মুখের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

বিরাজ তাহাও দেখিল। দেখিয়া বলিল, মিথ্যে কথা বলে আর কি হবে? এ সব কথা আমি কাউকে বল্‌ব না। তোর আঁচলে বাঁধা নোট কোথা থেকে এল, সে কথা আমি আগে বুঝি নি, কিন্তু এখন সব বুঝতে পাচ্ছি! যা, আজ থেকে তোকে আমি জবাব দিলুম—কাল আর আমার বাড়ী ঢুকিস্ নে।

এ কি কথা! নিদারুণ বিস্ময়ে সুন্দরী বাক্‌শূন্য হইয়া বসিয়া রহিল। এ বাটীতে তাহার কাজ গেল, এমন অসম্ভব কথা সে মনের মধ্যে ঠিক মত গ্রহণ করিতেও পারিল না। সে অনেক দিনের দাসী। সে বিরাজের বিবাহ দিয়াছে, হরিমতিকে মানুষ করিয়াছে, গৃহিণীর সহিত তীর্থদর্শন করিয়া আসিয়াছে—সেও যে এ বাটীর একজন। আজ তাহাকেই বিরাজ-বৌ বাটীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। ক্ষোভ এবং অভিমান তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল—এক মুহূর্ত্তে কত রকমের জবাব-দিহি, কত রকমের কথা তাহার জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিল, কিন্তু মুখ দিয়া শব্দ বাহির করিতে পারিল না—বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল।

বিরাজ মনে মনে সমস্ত বুঝিল, কিন্তু সেও কোন কথা কহিল না। মুখ ফিরাইয়া দেখিল, হাঁড়ির জল কমিয়া গিয়াছে। অদূরে একটা পিত্তলের কলসীতে জল ছিল, ঘটি লইয়া তাহার কাছে আসিল; কিন্তু কি ভাবিয়া এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া ঘটিটা রাখিয়া দিল—না, তোর হাতের জল ছুঁলে ওঁর অকল্যাণ হবে—তুই ঐ হাত দিয়ে টাকা নিয়েছিস্!

সুন্দরী এ তিরস্কারের উত্তরও দিতে পারিল না।

বিরাজ আর একটি প্রদীপ জ্বালিয়া কলসীটা তুলিয়া লইয়া সূচিভেদ্য অন্ধকারে আমবাগানের ভিতর দিয়া একা নদীতে জল আনিতে চলিয়া গেল। বিরাজ চলিয়া গেল, সুন্দরীর একবার মনে হইল, সে পিছনে যায়, কিন্তু সেই অন্ধকারে সঙ্কীর্ণ বন-পথ, চারিদিকের প্রাচীর, সপ্তগ্রামের জানা অজানা সমাধিস্তূপ, ঐ পুরাতন বটবৃক্ষ—সমস্ত দৃশ্যটা তাহার মনের মধ্যে উদিত হইবামাত্র তাহার সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া চুল পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। সে অস্ফুটস্বরে 'মা গো!' বলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

৫

দিন-দুই পরে নীলাম্বর বলিল, সুন্দরীকে দেখছি নে কেন বিরাজ ?

বিরাজ বলিল, আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েচি।

নীলাম্বর পরিহাস মনে করিয়া বলিল, বেশ করেচ। বল না কি হয়েচে তার ?

বিরাজ বলিল, কি আবার হবে, আমি সত্যিই তাকে ছাড়িয়ে দিয়েচি।

নীলাম্বর তথাপি কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অতিশয় বিস্মিত হইয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, তাকে ছাড়িয়ে দেবে কি করে ? আর সে যত দোষই করুক, কতদিনের পুরনো লোক, তা জান ? কি করেছিল সে ?

বিরাজ বলিল, ভাল বুঝেচি তাই ছাড়িয়ে দিয়েচি।

নীলাম্বর বিরক্ত হইয়া বলিল, কিসে ভাল বুঝলে, তাই জিজ্ঞেস কচ্চি।

বিরাজ স্বামীর মনের ভাব বুঝিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমি ভাল বুঝেচি—ছাড়িয়ে দিয়েচি, তুমি ভাল বুঝ, ফিরিয়ে আন গে। বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

নীলাম্বর বুঝিল, বিরাজ রাগিয়াছে, আর কোন কথা কহিল না। সে ঘণ্টা-খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া রান্নাঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু ছাড়িয়ে যে দিলে কাজ করবে কে ?

এবার বিরাজ মুখ ফিরাইয়া হাসিল। তাহার পরে বলিল, তুমি।

নীলাম্বরও হাসিয়া বলিল, তবে দাও, এঁটো বাসনগুলো মেজে ধুয়ে আনি।

বিরাজ হাতের খুন্তিটা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া হাত ধুইয়া কাছে আসিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বলিল, যাও তুমি এখান থেকে। একটা তামাসা করবার যো নাই—তা হ'লেই এমন কথা বলে বসবে যে কানে শুন্‌লে পাপ হয়।

নীলাম্বর অপ্রতিভ হইয়া বলিল, এও কানে শুন্‌লে পাপ হয়? তোর পাপ যে কিসে হয় না, তা ত বুঝি নে বিরাজ!

বিরাজ বলিল, তুমি সব বুঝ। না বুঝ্‌লে এত কাজ থাকতে এঁটো বাসনের কথা তুলতে না—যাও, আর বেলা ক'রো না, স্নান করে এসো—আমার রান্না হয়ে গেছে।

নীলাম্বর চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, সত্যি কথা বিরাজ, সংসারের কাজকর্ম্ম কর্‌বে কে?

বিরাজ চোখ তুলিয়া বলিল, কাজ আবার কোথায়? পুঁটি নেই, ঠাকুরপোরা নেই, আমিই ত কাজের অভাবে সারাদিন ব'সে কাটাই। বেশ ত কাজ যখন আট্‌কাবে তখন তোমাকে জানাব।

নীলাম্বর বলিল, না বিরাজ, সে হবে না, দাসী-চাকরের কাজ আমি তোমায় কর্‌তে দিতে পার্‌ব না। সুন্দরী কোন দোষ করে নি, শুধু খরচ বাঁচাবার জন্য তুমি তাকে সরিয়েছ, বল সত্যি কিনা?

বিরাজ বলিল, না সত্যি নয়! সে যথার্থ-ই দোষ করেচে।

কি দোষ?

তা আমি বল্‌ব না। যাও ব'সে থেক না, স্নান ক'রে এস। বলিয়া বিরাজও দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল; খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া নীলাম্বরকে একভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, কৈ, গেলে না? এখনও বসে আছ যে?

নীলাম্বর মৃদুস্বরে বলিল, যাই—কিন্তু বিরাজ, এ ত আমি সইতে পার্‌ব না, তোমাকে উঞ্ছবৃত্তি করতে দেব কি ক'রে?

কথাটা শুনিয়া বিরাজ খুসী হইল না। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কি কর্‌বে শুনি?

সুন্দরীকে না চাও, আর কোন লোক রাখি—তুমি একাই বা থাক্‌বে কি করে?

যেমন ক'রেই থাকি না কেন, আমি আর লোক চাই নে।

নীলাম্বর বলিল, না, সে হবে না। যতদিন সংসারে আছি ততদিন মান অপমানও আছে; পাড়ার লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে?

বিরাজ অদূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, পাড়ার লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে এইটাই তোমার আসল ভয়। আমি কি ক'রে থাক্‌ব, আমার দুঃখ কষ্ট হবে এ কেবল তোমার একটা—ছল!

নীলাম্বর ক্ষুব্ধ-বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া বলিল, ছল?

বিরাজ বলিল, হাঁ, ছল। আজকাল আমি সব জেনেছি। আমার মুখের দিকে যদি চাইতে, আমার দুঃখ ভাবতে, আমার একটা কথাও যদি শুন্‌তে, তা হ'লে আমার এ অবস্থা হ'ত না।

নীলাম্বর বলিল, তোমার একটা কথাও শুনি নি?

বিরাজ জোর করিয়া বলিল, না, একটাও না। যখন যা বলেচি, তাই কোন-না-কোন ছল ক'রে উড়িয়ে দিয়েচ—তুমি কেবল ভেবেচ নিজের পাপ হবে, মিথ্যা কথা হবে, লোকের কাছে অপযশ হবে—একবারও ভেবেচ কি আমার কি হবে?

নীলাম্বর বলিল, আমার পাপ কি তোমার পাপ নয়, আমার অপযশে কি তোমার অপযশ হবে না!

এবার বিরাজ রীতিমত ক্রুদ্ধ হইল। তীক্ষ্ণভাবে বলিল, দেখ ও সব ছেলে-ভুলানো কথা—ওতে ভোলবার বয়স আমার আর নেই। ক্ষণকাল

চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, কেবল তুমি নিজের কথা ভাব, আর কিছু ভাব না। অনেক দুঃখে আজ আমাকে এ কথা মুখ দিয়ে বার করতে হ'ল—আজ নিজের ঘরে আমাকে দাসীবৃত্তি করতে দিতে তোমার লজ্জা হচ্চে, কিন্তু কাল যদি তোমার একটা কিছু হয়, পরশু যে আমাকে পরের ঘরে গিয়ে দুটো ভাতের জন্যে দাসীবৃত্তি ক'রে বেড়াতে হবে! তবে একটা কথা এই যে, সে তোমাকে চোখে দেখতেও হবে না, কানে শুনতেও হবে না—কাজে কাজেই তাতে তোমার লজ্জাও হবে না, ভাবনাচিন্তা করবার দরকার নেই—এই না?

নীলাম্বর সহসা এ অভিযোগের উত্তর দিতে পারিল না। মাটির দিকে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া চোখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ কখনও তোমার মনের কথা নয়। দুঃখ-কষ্ট হয়েচে ব'লেই রাগ করে বল্‌চ। তোমার কষ্ট আমি যে স্বর্গে বসেও সইতে পারব না, এ তুমি ঠিক জান।

বিরাজ বলিল, তাই আগে জানতুম্ বটে, কিন্তু কষ্ট যে কি, তা কষ্টে না পড়্‌লে যেমন ঠিক বোঝা যায় না, পুরুষমানুষের মায়া দয়াও তেমনই সময় না হ'লে টের পাওয়া যায় না; কিন্তু তোমার সঙ্গে এই দুপুর-বেলায় আমি রাগারাগি করতে চাই নে—যা বল্‌চি তাই কর, যাও নেয়ে এস।

যাচ্চি, বলিয়াও নীলাম্বর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, আজ দুবছর হ'তে চলল, পুঁটির আমার বিয়ে হয়েচে। তার আগে থেকে আজ পর্য্যন্ত সব কথা সেদিন আমি মনে মনে ভেবে দেখ্‌ছিলুম—আমার একটি কথাও তুমি শোন নি। যখন যা কিছু বলেচি, সমস্তই একটা একটা করে কাটিয়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছায় কাজ ক'রে গেছ! লোকে বাড়ীর দাসী-চাকরেরও একটা কথা রাখে, কিন্তু তুমি তাও আমার রাখ নি।

নীলাম্বর কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই বিরাজ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না না, তোমার সঙ্গে তর্ক কর্‌ব না। কত বড় ঘেন্নায় যে আমি ইষ্টিদেবতার নাম ক'রে দিব্যি করেচি, তোমাকে আর একটি কথাও বল্‌তে যাব না, সে কথা তুমি শুন্‌তে পেতে না, আজ যদি না, কথায় কথা উঠে পড়্‌ত। এখন হয়ত তোমার মনে পড়্‌বে না, কিন্তু ছেলে-বেলায় একদিন আমি মাথার ব্যথায় ঘুমিয়ে পড়ি; তোমাকে দোর খুলে দিতে দেরি হয়েছিল ব'লে মারতে উঠেছিলে, আমার অসুখের কথা বিশ্বাস কর নি। সেই দিন থেকে দিব্যি করেছিলুম, অসুখের কথা আর জানাব না—আজ পর্য্যন্ত সে দিব্যি ভাঙিনি।

নীলাম্বর মুখ তুলিতেই দুজনের চোখাচোখি হইয়া গেল। সে সহসা উঠিয়া আসিয়া বিরাজের হাত দুইটি ধরিয়া ফেলিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে বলিয়া উঠিল, সে হবে না বিরাজ, কথনও তোমার দেহ ভাল নেই। কি অসুখ হয়েচে বল—বলতেই হবে।

বিরাজ ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ছাড়, লাগ্‌ছে।

লাগুক, বল কি হয়ে

বিরাজ শুষ্কভাবে একটুখানি হাসিয়া বলিল, কই কিছুই ত হয় নি, বেশ আছি।

নীলাম্বর অবিশ্বাস করিয়া বলিল, না, কিছুতেই তুমি বেশ নেই। না হ'লে কথনও তুমি সেই কত বৎসরের পুরনো কথা তুলে আমার মনে কষ্ট দিতে না—বিশেষ যার জন্যে কতদিন, কত মাপ চেয়েছি।

আচ্ছা, আর কোন দিন বল্‌ব না, বলিয়া বিরাজ নিজেকে মুক্ত করিয়া ঈষৎ সরিয়া বসিল।

নীলাম্বর তাহার অর্থ বুঝিল; কিন্তু আর কিছু বলিল না। তারপর মিনিট দুই-তিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল।

রাত্রে প্রদীপের আলোকে বসিয়া বিরাজ চিঠি লিখিতেছিল। নীলাম্বর খাটের উপর শুইয়া নিঃশব্দে তাহাকে দেখিতে দেখিতে সহসা বলিয়া উঠিল, এ-জন্মে তোমার ত কোন দোষ অপরাধ শত্রুতেও দিতে পারে না, কিন্তু তোমার পূর্ব্বজন্মের পাপ ছিল, না হ'লে কিছুতেই এমন হ'ত না?

বিরাজ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ত না?

নীলাম্বর কহিল, তোমার সমস্ত দেহ মন ভগবান রাজরাণীর উপযুক্ত করে গড়েছিলেন, কিন্তু—

কিন্তু কি?

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ এক মুহূর্ত্ত উত্তরের আশায় থাকিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, এ খবর কখন্ তোমাকে ভগবান দিয়ে গেলেন?

নীলাম্বর কহিল, চোখ-কান থাকলে ভগবান সকলকেই খবর দেন!

হুঁ, বলিয়া বিরাজ চিঠি লিখিতে লাগিল।

নীলাম্বর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, তখন বল্‌ছিলে, আমি কোন কথা তোমার শুনি নে, হয়ত তাই সত্যি, কিন্তু তা কি শুধু একলা আমারই দোষ?

বিরাজ আবার মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, বেশ ত, আমার দোষটাই দেখিয়ে দাও।

নীলাম্বর বলিল, তোমার দোষ দেখাতে পারব না; কিন্তু আজ একটা সত্যি কথা বলব। তুমি নিজের সঙ্গে অপরের তুলনা ক'রেই দেখ; কিন্তু এটা ত একবার ভেবে দেখ না, তোমার মত কটা মেয়েমানুষ এমন নির্গুণ মূর্খের হাতে পড়ে? এইটেই তোমার পূর্ব্ব জন্মের পাপ, নইলে তোমার ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার কথা নয়।

বিরাজ নিঃশব্দে চিঠি লিখিতে লাগিল। বোধ করি সে মনে করিল,

ইহার জবাব দিবে না ; কিন্তু থাকিতে পারিল না। মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি মনে কর, এই সব কথা শুন্‌লে আমি খুসি হই ?

কি সব কথা ?

বিরাজ বলিল, এই যেমন রাজরাণী হ'তে পারতুম—শুধু তোমার হাতে প'ড়েই এমন হয়েচি, এই সব ; মনে কর, এ শুন্‌লে, আমার আহ্লাদ হয়, না, যে বলে, তার মুখ দেখতে ইচ্ছে করে ?

নীলাম্বর দেখিল বিরাজ অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইবে, সে আশা করে নাই, তাই মনে মনে সঙ্কুচিত এবং কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল ; কিন্তু কি বলিয়া প্রসন্ন করিবে, সহসা তাহাও ভাবিয়া পাইল না।

বিরাজ বলিল, রূপ, রূপ, রূপ। শুনে শুনে কান আমার ভোঁতা হয়ে গেল ; কিন্তু আর যারা বলে, তাদের না হয় এইটেই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে, কিন্তু তুমি স্বা মী,এতটুকু বয়স থেকে তোমাকে ধ'রে এত বড় হয়েচি, তুমিও কি এর বেশি আমার আর কিছু দেখ না ? এইটেই কি আমার সবচেয়ে বড় বস্তু ? তুমি কি ব'লে এ কথা মুখে আন ? আমি কি রূপের ব্যবসা করি, না এই দিয়ে তোমাকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চাই ?

নীলাম্বর অত্যন্ত ভয় পাইয়া থতমত খাইয়া বলিতে গেল, না না, তা নয়—

বিরাজ কথার মাঝেই বলিয়া উঠিল, ঠিক তাই ; সেই জন্যেই একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম আমি কাল-কুচ্ছিত হ'লে ভালবাসতে কিনা—মনে পড়ে ?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পড়ে, কিন্তু তুমিই ত তখন বলেছিলে—

বিরাজ বলিল, হাঁ বলেছিলুম, আমি কাল-কুচ্ছিত হ'লেও ভালবাসতে, কেন না, আমাকে বিয়ে করেছ। গেরস্তর মেয়ে, গেরস্তর বউ, আমাকে এ সব কথা শোনাতে তোমার লজ্জা করে না। এর

পূর্ব্বেও আমাকে তুমি এ কথা বলেচ। বলিতে বলিতে তাহার ক্রোধে অভিমানে চোখে জল আসিয়া পড়িল এবং সেই জল প্রদীপের আলোকে চক্ চক্ করিয়া উঠিল।

নীলাম্বর দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল। বিরাজ নিজেই একদিন বলিয়া দিয়াছিল, তিনি হাত ধরিলে আর তার রাগ থাকে না।

নীলাম্বর সেই কথা হঠাৎ স্মরণ করিয়া উঠিয়া আসিয়া তাহার ডান হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে লইয়া পার্শ্বে উপবেশন করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ বাঁ হাত দিয়া নিজের চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

সেই রাত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নিঃশব্দে জাগিয়াছিল। এক সময়ে নীলাম্বর সহসা স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, আজ কেন অত রাগ করলে বিরাজ?

বিরাজ জবাব দিল, কেন তুমি ও সব কথা বল্‌লে?

নীলাম্বর বলিল, আমি ত মন্দ কথা বলি নি।

বিরাজ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল; অধীরভাবে বলিল, তবু বল্‌বে মন্দ কথা নয়? খুব মন্দ কথা! অত্যন্ত মন্দ কথা! ওই জন্যেই সুন্দরীকে—

সে আর বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

নীলাম্বর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, শুধু এই দোষে তাকে তাড়িয়ে দিলে?

হুঁ, বলিয়া বিরাজ চুপ করিল।

নীলাম্বর আর প্রশ্ন করিল না।

তখন বিরাজ নিজেই বলিল, দেখ, জেরা ক'রো না—আমি কচিখুকী নই—ভালমন্দ বুঝি। তাড়াবার মত দোষ করেছে ব'লেই তাড়িয়েছি। কেন, কি বৃত্তান্ত, এত কথা তুমি পুরুষমানুষ নাই শুন্‌লে!

না, আর শুন্‌তে চাই নে, বলিয়া নীলাম্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইল।

পৃথগন্ন হইবার দুই-চারিদিন পরেই ছোটবাবু পীতাম্বর বাটীর মাঝখানে দরমা ও ছেঁচা বাঁশের বেড়া দিয়া নিজের অংশ আলাদা করিয়া লইয়াছিল। দক্ষিণদিকে দরজা ফুটাইয়া এবং তাহার সম্মুখে ছোট বৈঠকখানা-ঘর করিয়া সে সর্ব্বরকমে নিজের বাড়ীটিকে বেশ মানান-সই ঝরঝরে করিয়া লইয়া মহা-আরামে জীবন-যাপন করিতেছিল। কোন দিনই প্রায় সে দাদার সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা বলিত না। এখন সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এদিকে বিরাজকে প্রায় সমস্তদিন একলাটি কাটাইতে হইত। সুন্দরীর যাওয়ার পর হইতে শুধু যে সমস্ত কাজ কর্ম্ম তাহাকেই করিতে হইত তাহা নহে; যে সব কাজ পূর্ব্বে দাসীতে করিত, সেইগুলা লোকলজ্জাবশতঃ লোকচক্ষুর অন্তরালেই তাহাকে সমাধা করিয়া লইবার জন্য অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতে হইত। এমনই একদিন কাজ করিতেছিল, অকস্মাৎ ও-বাড়ী হইতে বেড়ার ফাঁক দিয়া অতি মৃদু-কণ্ঠে ডাক আসিল, দিদি! রাত যে অনেক হয়েচে।

বিরাজ চমকিয়া মুখ তুলিল। যে ডাকিয়াছিল, সে তেমনি মৃদুস্বরে আবার কহিল, দিদি, আমি মোহিনী।

বিরাজ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কে ছোটবৌ? এত রাত্তিরে?

হাঁ দিদি, আমি, একবারটি কাছে এস।

বিরাজ বেড়ার কাছে আসিতেই ছোটবৌ চুপি চুপি বলিল, দিদি, বট্‌ঠাকুর ঘুমিয়েছেন?

বিরাজ বলিল, হাঁ।

মোহিনী বলিল, দিদি একটা কথা আছে, কিন্তু বল্‌তে পাচ্ছি নে, বলিয়া চুপ করিল।

বিরাজ তাহার কণ্ঠের স্বরে বুঝিল, ছোটবৌ কাঁদিতেছে, চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কি হয়েচে ছোটবৌ ?

ছোটবৌ তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিল না, বোধ করি সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিল এবং নিজেকে সংবরণ করিতে লাগিল।

বিরাজ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, কি ছোটবৌ ?

এবার সে ভাঙা ভাঙা গলায় বলিল, বট্‌ঠাকুরের নামে নালিশ হয়েচে, কাল শমন না কি বার হবে, কি হবে দিদি ?

বিরাজ ভয় পাইল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল, শমন বার হবে, তার আর ভয় কি ছোটবৌ ?

ভয় নেই দিদি ?

ভয় আর কি ? কিন্তু নালিশ করলে কে ?

ছোটবৌ বলিল, ভুলু মুকুয্যে।

বিরাজ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিল, যাক্ আর বল্‌তে হবে না—বুঝেচি, মুখুয্যেমশাই ওঁর কাছে টাকা পাবেন, তাই বোধ করি নালিশ করেছেন, কিন্তু তাতে ভয়ের কথা নেই ছোটবৌ। তার পর উভয়েই মৌন হইয়া রহিল। খানিক পরে ছোটবৌ কহিল, দিদি, কোন দিন তোমার সঙ্গে বেশি কথা কই নি—কথা কইবার যোগ্যও আমি নই—আজ ছোটবোনের একটি কথা রাখ্‌বে দিদি ?

তাহার কণ্ঠস্বরে বিরাজ আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল, এখন অধিকতর আর্দ্র হইয়া বলিল, কেন রাখ্‌ব না বোন ?

তবে একবারটি হাত পাত। বিরাজ হাত পাতিতেই একটি ক্ষুদ্র কোমল হাত বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া তাহার হাতের উপর একছড়া সোনার হার রাখিয়া দিল।

বিরাজ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কেন ছোটবৌ ?

ছোটবৌ কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া বলিল, এইটে বিক্রি

ক'রে হোক্, বাঁধা দিয়ে হোক্, ওর টাকা শোধ করে দাও দিদি।

এই আকস্মিক অযাচিত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব সহানুভূতিতে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিরাজ অভিভূত হইয়া পড়িল—কথা কহিতে পারিল না; কিন্তু—চল্‌লুম দিদি, বলিয়া ছোটবৌ সরিয়া যায় দেখিয়া, সে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া উঠিল, যেও না ছোটবৌ, শোন।

ছোটবৌ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কেন দিদি?

বিরাজ সেই ফাঁকটা দিয়া তৎক্ষণাৎ অপর দিকে হারটা ফেলিয়া দিয়া বলিল, ছি, এ সব কর্‌তে নেই।

ছোটবৌ তাহা তুলিয়া লইয়া ক্ষুব্ধস্বরে প্রশ্ন করিল, কেন করতে নেই?

বিরাজ বলিল, ঠাকুরপো শুন্‌লে কি বল্‌বেন?

কিন্তু তিনি ত শুন্‌তে পাবেন না।

আজ না হ'ক, দুদিন পরে জানতে পারবেন, তখন কি হবে?

ছোটবৌ বলিল, তিনি কোনদিন জান্‌তে পারবেন না দিদি! গত বছর মা মর্‌বার সময় এটি লুকিয়ে আমাকে দিয়ে যান, তখন থেকে কোন দিন পরি নি, কোন দিন বার করি নি—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, এটি তুমি নাও।

তাহার কাতর অনুনয়ে বিরাজের চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে স্তব্ধ হইয়া এই দুই নিঃসম্পর্কীয়া রমণীর আচরণের সহিত বাটীর দুই সহোদরের আচরণ তুলনা করিয়া দেখিল। তারপর হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, আজকের কথা মরণকাল পর্য্যন্ত আমার মনে থাকবে বোন; কিন্তু আমি এ নিতে পার্‌ব না। তা' ছাড়া স্বামীকে লুকিয়ে কোন মেয়েমানুষের কোন কাজই করা উচিত নয় ছোটবৌ! তাতে তোমার আমার দুজনেরই পাপ।

ছোটবৌ বলিল, তুমি সব কথা জান না, তাই বল্‌চ;' কিন্তু

ধর্ম্মাধর্ম্ম আমারও ত আছে দিদি—আমিই বা মরণকালে কি জবাব দেব ?

বিরাজ আর একবার চোখ মুছিয়া, নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, আমি সকলকেই চিনেছিলুম ছোটবৌ, শুধু তোমাকেই এত দিন চিন্‌তে পারি নি ; কিন্তু তোমাকে ত মরণকালে কোন জবাব দিতে হবে না, সে জবাব এতক্ষণ তোমার অন্তর্যামী নিজেই লিখে নিয়েছেন। যাও—রাত হ'ল, শোও গে বোন্। বলিয়া প্রত্যুত্তরের অবসর না দিয়াই বিরাজ দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

কিন্তু সে ঘরেও ঢুকিতে পারিল না। অন্ধকার বারান্দার একধারে আসিয়া আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার নালিশ-মোকদ্দমার কথা মনে হইল না, কিন্তু ওই স্বল্পভাষিণী ক্ষুদ্রকায়া ছোটজায়ের সকরুণ কথাগুলি মনে করিয়া প্রস্রবণের মত তাহার দুই চোখ বাহিয়া নিরন্তর জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আজ সবচেয়ে দুঃখটা তাহার এই বাজিতে লাগিল যে, এতদিন এত কাছে পাইয়াও সে তাহাকে চিনিতে পারে নাই, চিনিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করে নাই, অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা না করিলেও একটি দিনও তাহার হইয়া কখনও ভাল কথা বলে নাই। সুতীক্ষ্ণ বাজের আলো একমুহূর্ত্তে যেমন করিয়া অন্ধকার চিরিয়া ফেলে, আজ ছোটবৌ তেম্‌নি করিয়া তাহার বুকের অন্তস্তল পর্য্যন্ত যেন চিরিয়া দিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে কখন এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ কাহার হস্ত-স্পর্শে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল, নীলাম্বর আসিয়া তাহার শিয়রের কাছে বসিয়াছে।

নীলাম্বর সংক্ষেপে বলিল, ঘরে চল, রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বিরাজ কোন কথা না বলিয়া স্বামীর দেহ অবলম্বন করিয়া নিঃশব্দে ঘরে আসিয়া নির্জীবের মত শুইয়া পড়িল।

এক বৎসর কাটিয়াছে। এ বৎসর দুই আনা ফসলও পাওয়া যায় নাই। যে জমিগুলি হইতে প্রায় সারা বছরের ভরণপোষণ চলিত, তাহার অনেকটাই ও-পাড়ার মুখুয্যেমশাই কিনিয়া লইয়াছেন। ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িয়াছে, ছোটভাই পীতাম্বর গোপনে নিজের নামে ফিরাইয়া লইয়াছে—তাহাও জানাজানি হইয়াছে। হালের একটা গরু মরিয়াছে, পুকুর রোদে ফাটিতেছে—বিরাজ কোন দিকে চাহিয়া আর কূল-কিনারা দেখিতে পাইল না। দেহের কোন একটা স্থান বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখিলে একটা অসহ্য অথচ অব্যক্ত মন্দ যাতনায় সর্ব্বদেহটা যে রকম করিয়া ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া আসিতে থাকে, সমস্ত সংসারের সহিত সম্বন্ধটা তাহার তেমনই হইয়া আসিতে লাগিল। আগে সে যখন তখন হাসিত, কথায় কথায় ছল ধরিয়া পরিহাস করিত; কিন্তু এখন বাড়ীর মধ্যে এমন একটি লোক নাই যে, সে কথা কহে। অথচ কেহ দেখা করিতে আসিলে সংবাদ লইতে ইচ্ছা করিলেও সে ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়। অভিমানী প্রকৃতি তাহার, পাড়ার লোকের একটা কথাতেও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সংসারের কোন কাজে তাহার যে আর লেশমাত্র উৎসাহ নাই, তাহা তাহার কাজের দিকে চোখ ফিরাইলেই চোখে পড়ে। তাহার ঘরের শয্যা মলিন, কাপড়ের আলনা অগোছান, জিনিসপত্র অপরিচ্ছন্ন—সে ঝাঁট দিয়া ঘরের কোণে জঞ্জাল জড় করিয়া রাখে—তুলিয়া ফেলিয়া দিবার মত জোরও সে যেন নিজের দেহের মধ্যে খুঁজিয়া পায় না। এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল। ইতিমধ্যে নীলাম্বর ছোটবোন হরিমতিকে দুইবার আনিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা পাঠায় নাই। দিন-পনর হইল এক-খানা চিঠি লিখিয়াছিল, হরিমতির শ্বশুর তাহার জবাব পর্য্যন্ত দেয় নাই; কিন্তু বিরাজের কাছে তাহার নামটি পর্য্যন্ত করিবার যো নাই। সে একে-

বারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠে। পুঁটিকে মানুষ করিয়াছে। মায়ের মত ভালবাসিয়াছে, কিন্তু তাহার সমস্ত সংস্রব পর্য্যন্ত আজকাল তাহার কাছে বিষ হইয়া গিয়াছে।

আজ সকালে নীলাম্বর গ্রামের পোষ্ট অফিস হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বিমর্ষ মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, পুঁটির শ্বশুর একটা জবাব পর্য্যন্ত দিলে না—এ পূজোতেও বোধ করি বোনটিকে একবার দেখতে পেলাম না।

বিরাজ কাজ করিতে করিতে একবার মুখ তুলিল। কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু কিছুই না বলিয়া উঠিয়া গেল।

সেই দিন দুপুর-বেলা আহারে বসিয়া নীলাম্বর আস্তে আস্তে বলিল, তার নাম কর্‌লেও তুমি জ্বলে ওঠ—সে কি কোন দোষ করেছে?

বিরাজ অদূরেই বসিয়াছিল, চোখ তুলিয়া বলিল, জ্বলে উঠি কে বল্‌লে?

কে আর বল্‌বে, আমি নিজেই টের পাই।

বিরাজ ক্ষণকাল স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, পেলেই ভাল, বলিয়াই উঠিয়া যাইতেছিল, নীলাম্বর ডাকিয়া বলিল, আচ্ছা, আজকাল এমন হয়ে উঠ্‌ছ কেন! এ যেন একেবারে বদলে গেছ!

বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কথাটা মন দিয়া শুনিয়া বলিল, বদ্‌লালেই বদ্‌লাতে হয়, বলিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহার দুই-তিন দিন পরে অপরাহ্ন-বেলায় নীলাম্বর বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে একা বসিয়া গুন গুন করিয়া গান গাহিতেছিল, বিরাজ আসিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া বলিল, কি?

বিরাজ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, জবাব দিল না।

নীলাম্বর মুখ নিচু করিতেই বিরাজ রুক্ষস্বরে বলিল, আর একবার মুখ তোল দেখি!

নীলাম্বর মুখও তুলিল না, জবাবও দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ পূর্ব্ববৎ কঠিনভাবে বলিল, এই যে চোখ বেশ রাঙা হয়েছে, আবার ঐগুলো খেতে সুরু করেছ ?

নীলাম্বর কথা কহিল না। ভয়ে চোখ নিচু করিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। একে ত চিরদিনই সে তাহাকে ভয় করে, তাহাতে কিছুদিন হইতেই বিরাজ এমনই একরাশি উত্তপ্ত বারুদের মত হইয়া আছে যে, কখন কি ভাবে জ্বলিয়া উঠিবে তাহা আন্দাজ পর্য্যন্ত করিবার যো ছিল না।

বিরাজও কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, সেই ভাল, গাঁজা-গুলি খেয়ে বোম্-ভোলা হয়ে ব'সে থাকার এই ত সময়, বলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। সেদিন গেল, তার পরদিন নীলাম্বর আর থাকিতে না পারিয়া সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া সকাল-বেলা পীতাম্বরকে বাহিরের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, পুঁটির শ্বশুর ত একটা জবাব পর্য্যন্ত দিলে না—তুই একবার চেষ্টা করে দেখ্ না, যদি বোনটিকে দুটো দিনের তরেও আন্‌তে পারিস্।

পীতাম্বর দাদার মুখপানে চাহিয়া বলিল, তুমি থাকতে আমি আবার কি চেষ্টা কর্‌ব ?

নীলাম্বর তাহার শঠতা বুঝিয়া ভিতরে ক্রুদ্ধ হইল; কিন্তু সে ভাব যথা-সাধ্য গোপন করিয়া বলিল, তা হোক, যেমন আমার, তোরও ত সে তেমনই বোন্। না হয়, মনে কর্ না, আমি ম'রে গেছি, এখন, তুই শুধু একলা আছিস্।

পীতাম্বর কহিল, যা সত্যি নয়, তা, তোমার মত আমি মনে করতে পারিনে। আর তোমাকে চিঠির জবাব দিলে না, আমাকেই বা দেবে কেন ?

নীলাম্বর ছোটভাইয়ের এ কথাটাও সহ্য করিয়া লইয়া বলিল, যা সত্যি নয়, তাই আমি মনে করি ? আচ্ছা তাই ভাল, এ নিয়ে তোর সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে চাই নে, কিন্তু আমার চিঠির জবাব দেয় না এই জন্যে যে,

আমি বিয়ের সমস্ত সর্ত্ত পালন করতে পারি নি ; কিন্তু সে সব কথার জন্তে ত তোকে ডাকি নি—যা বল্‌চি, পারিস্‌ কি না, তাই বল্‌।

পীতাম্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, না, বিয়ের আগে আমাকে জিজ্ঞেস্‌ করেছিলে ?

কর্‌লে কি হ'ত ?

পীতাম্বর বলিল, ভাল পরামর্শই দিতুম।

নীলাম্বরের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল, তাহার ওষ্ঠাধরও কাঁপিতে লাগিল, তবুও সে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিল, তা হ'লে পার্‌বি নে ?

পীতাম্বর বলিল, না। আর পুঁটির শ্বশুরও যা, নিজের শ্বশুরও তাই—এঁরা গুরুজন। তিনি যখন পাঠাতে ইচ্ছে করেন না, তখন তাঁর বিরুদ্ধে আমি কথা কইতে পারি নে—ও স্বভাব আমার নয়।

তাহার কথা শুনিয়া নীলাম্বরের একবার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া লাথি মারিয়া উহার ঐ মুখ গুঁড়া করিয়া ফেলে, কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, যা, বেরো—যা আমার সাম্‌নে থেকে।

পীতাম্বর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল, থামকা রাগ কর কেন দাদা ? না গেলে তুমি কি আমাকে জোর ক'রে তাড়াতে পার ?

নীলাম্বর দরজার দিকে হাত প্রসারিত করিয়া বলিল, বুড়ো বয়সে মার খেয়ে যদি না মর্‌তে চাস্‌, সরে যা আমার স্থমুখ থেকে !

তথাপি পীতাম্বর কি একটা বলিতে যাইতেছিল ; কিন্তু নীলাম্বর বাধা দিয়া বলিল, বাস্‌! একটি কথাও না—যাও।

গোঁয়ার নীলাম্বরের গায়ের জোর প্রসিদ্ধ ছল।

পীতাম্বর আর কথা কহিতে সাহস করিল না, আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

বিরাজ গোলমাল শুনিয়া বাহিরে আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরের

মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, ছি, সমস্ত জেনে শুনে কি ভাইয়ের সঙ্গে কেলেঙ্কারী কর্‌তে আছে?

নীলাম্বর উদ্ধতভাবে জবাব দিল, জানি ব'লে কি ভয়ে জড়সড় হ'য়ে থাকব? আমার সব সহ্য হয় বিরাজ, ভণ্ডামী সহ্য হয় না।

বিরাজ বলিল, কিন্তু তুমি ত একা নও, আজ হাত ধ'রে বার করে দিলে কাল কোথায় দাঁড়াবে সে কথা একবার ভাব কি?

নীলাম্বর বলিল, না। যিনি ভাববার তিনি ভাব্‌বেন, আমি ভেবে মিথ্যে দুঃখ পাই নে।

বিরাজ জবাব দিল, তা ঠিক! যার কাজের মধ্যে খোল বাজান আর মহাভারত পড়া—তার ভাবনা চিন্তে মিছে!

কথাগুলি বিরাজ মধুর করিয়া বলে নাই, নীলাম্বরের কানেও তাহা মধু বর্ষণ করিল না, তথাপি সে সহজভাবে বলিল, ওগুলো আমি সবচেয়ে বড় কাজ ব'লেই মনে করি। তা ছাড়া, ভাবতে থাক্‌লেই কি কপালের লেখা মুছে যাবে? বলিয়া সে একবার কপালে হাত দিয়া বলিল, চেয়ে দেখ্‌ বিরাজ, এইখানে লেখা ছিল ব'লে অনেক রাজা-মহারাজাকে গাছতলায় বাস কর্‌তে হয়েচে—আমি ত অতি তুচ্ছ!

বিরাজ অন্তরের মধ্যে দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল, বলিল, ও-সব মুখে বলা যত সহজ, কাজে করা তত সহজ নয়! তা ছাড়া তুমিই না হয় গাছতলায় বাস কর্‌তে পার, আমি ত পারি নে। মেয়েমানুষের লজ্জাসরম আছে—আমাকে খোসামোদ করে হ'ক্, দাসীবৃত্তি করে হ'ক, একটুখানি আশ্রয়ের মধ্যে বাস কর্‌তেই হবে। ছোটভাইয়ের মন যুগিয়ে থাক্‌তে না পার, অন্ততঃ হাতাহাতি ক'রে সব দিক্ মাটি ক'র না। বলিয়া সে চোখের জল চাপিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

স্বামী-স্ত্রীতে ইতিপূর্ব্বে অনেকবার অনেক কলহ হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর তাহা জানিত, কিন্তু আজ যাহা হইয়া গেল তাহা কলহ নহে—

এ মূর্ত্তি তাহার কাছে একেবারেই অপরিচিত। সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বিরাজ আবার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, অমন হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বেলা হয়েছে—যাও, স্নানাহ্নিক করে দুটো খাও—যে কটা দিন পাওয়া যায়, সেই কটা দিনই লাভ। বলিয়া আর একবার সে স্বামীর বুকে শূল বিঁধিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

এই ঘরের দেওয়ালে একটি রাধা-কৃষ্ণের পট ঝোলান ছিল, সেই দিকে চাহিয়া নীলাম্বর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল; কিন্তু পাছে কেহ জানিতে পায়, এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

আর বিরাজ? সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া কেবলই তাহার চোখে যখন তখন জল আসিয়া পড়িতে লাগিল। যাঁহার এতটুকু কষ্ট সে সহিতে পারিত না, তাঁহাকে এত বড় শক্ত কথা নিজের মুখে বলিয়া অবধি তাহার দুঃখ ও আত্মগ্লানির সীমা ছিল না, সমস্ত দিন জল স্পর্শ করিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিছামিছি এ-ঘর ও-ঘর করিয়া ফিরিল, তাহার পর সন্ধ্যার সময় তুলসী-তলায় দীপ জ্বালিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়াই একেবারে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সমস্ত বাড়ী নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। নীলাম্বর বাড়ী নাই, তিনি দুপুর-বেলা একটিবার মাত্র পাতের কাছে বসিয়াই উঠিয়া গিয়াছিলেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।

বিরাজ কি করিবে, কোথায় যাইবে, কাহার কাছে কি বলিবে—আজ কোন দিকে চাহিয়া কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া সে সেইখানে অন্ধকার উঠানের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল: কেবলই বলিতে লাগিল, অন্তর্য্যামী ঠাকুর, একটিবার মুখ তুলে চাও! যে লোক কোন দোষ, কোন পাপ কর্‌তে জানে না, তাকে আর কষ্ট দিও না ঠাকুর—আর আমি সইতে পার্‌ব না।

রাত্রি তখন নটা বাজিয়া গিয়াছিল, নীলাম্বর নিঃশব্দে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল।

বিরাজ ঘরে ঢুকিয়া পায়ের কাছে বসিল।

নীলাম্বর চাহিয়াও দেখিল না, কথাও কহিল না।

খানিক পরে বিরাজ স্বামীর পায়ের উপর একটা হাত রাখিতেই তিনি পা সরাইয়া লইলেন। আরও মিনিট্-পাঁচেক নিস্তব্ধে কাটিল—বিরাজের লুপ্ত অভিমান ধীরে ধীরে সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল, তথাপি সে মৃদুস্বরে বলিল, খাবে চল।

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল। বিরাজ বলিল, সমস্ত দিন যে খেলে না, এটা কার ওপর রাগ ক'রে শুনি?

ইহাতেও নীলাম্বর জবাব দিল না।

বিরাজ বলিল, বল না শুনি?

নীলাম্বর উদাসভাবে বলিল, শুনে কি হবে?

বিরাজ বলিল, তবু শুনিই না।

এবার নীলাম্বর অকস্মাৎ উঠিয়া বসিল, বিরাজের মুখের উপর দুই চোখ সুতীক্ষ্ণ শূলের মত উদ্যত করিয়া বলিল, তোর আমি গুরুজন বিরাজ, খেলার জিনিস নয়!

তাহার চোখের চাহনি, গলার শব্দ শুনিয়া বিরাজ সভয়ে চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন আর্ত্ত, এমন গভীর কণ্ঠস্বর সে ত কোন দিন শুনে নাই!

মগ্‌রার গঞ্জে কয়েকটা পিতলের কল্কার কারখানা ছিল। এ পাড়ার চাঁড়ালদের মেয়েরা মাটির ছাঁচ তৈরী করিয়া সেখানে বিক্রি করিয়া আসিত। অসহ্য দুঃখের জ্বালায় বিরাজ তাহাদেরই একটি মেয়েকে ডাকিয়া ছাঁচ তৈরী করিতে শিখিয়া লইয়াছিল। সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী এবং অসাধারণ কর্ম্মপটু, দুদিনেই এ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু প্রস্তুত করিতে লাগিল। ব্যাপারীরা আসিয়া এগুলি নগদ মূল্য দিয়া কিনিয়া লইয়া যাইত। রোজ এমনই করিয়া সে আট আনা দশ আনা উপার্জ্জন করিতেছিল, অথচ স্বামীর কাছে লজ্জায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিত না। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে, অনেক রাত্রে নিঃশব্দে শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া এই কাজ করিত। আজ রাত্রেও তাহাই করিতে আসিয়াছিল এবং ক্লান্তিবশতঃ কোন এক সময়ে সেইখানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নীলাম্বর হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া শয্যায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজের হাতে তখনও কাদা মাখা, আশে-পাশে তৈরী ছাঁচ পড়িয়া আছে এবং তাহারই একধারে হিমের মধ্যে ভিজা মাটির উপরে পড়িয়া সে ঘুমাইতেছে। আজ তিন দিন ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা ছিল না। তপ্ত অশ্রুতে তাহার দুই চোখ ভরিয়া গেল, সে তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া বিরাজের ভূলুণ্ঠিত সুপ্ত মাথাটি সাবধানে নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইল। বিরাজ জানিল না, শুধু একটিবার নড়িয়া চড়িয়া পা দুটি আরও একটু গুটাইয়া লইয়া ভাল করিয়া শুইল। নীলাম্বর বাঁ হাত দিয়া নিজের চোখ মুছিয়া ফেলিয়া অপর হাতে অদূরবর্ত্তী স্তিমিত দীপটি আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া একদৃষ্টে পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ কি হইয়াছে! কৈ, এত দিন সে ত চাহিয়া দেখে নাই! বিরাজের চোখের

কোণে এমন কালি পড়িয়াছে। ভ্রূর উপর, সুন্দর সুডৌল ললাটে দুশ্চিন্তার এত সুস্পষ্ট রেখা ফুটিয়াছে! একটা অবোধ্য, অব্যক্ত, অপরিসীম বেদনায় তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল এবং অসাবধানে এক ফোঁটা বড় অশ্রু বিরাজের নিমীলিত চোখের পাতার উপর টপ্ করিয়া পড়িবামাত্রই সে চোখ চাহিয়া দেখিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, তার পর দুই হাত প্রসারিত করিয়া স্বামীর বক্ষ বেষ্টন করিয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া পাশ ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইল। নীলাম্বর সেই ভাবে বসিয়া থাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। বহুক্ষণ কাটিল—কেহ কথা কহিল না। তারপর রাত্রি যখন আর বেশি বাকি নাই, পূর্ব্বাকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে, তখন নীলাম্বর নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া স্ত্রীর মাথার উপর হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিল, হিমে থেক না বিরাজ, ঘরে চল।

চল, বলিয়া বিরাজ উঠিয়া পড়িল এবং স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সকাল-বেলা নীলাম্বর বলিল, যা তোর মামার বাড়ী থেকে দিন-কতক ঘুরে আয় বিরাজ, আমিও একবার কল্‌কাতায় যাই।

কল্‌কাতায় গিয়ে কি হবে?

নীলাম্বর কহিল, কত রকম উপার্জ্জনের পথ সেখানে আছে, যা হোক একটা উপায় হবেই—কথা শোন্ বিরাজ, মাস-খানেক সেখানে গিয়ে থাক্ গে।

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, কতদিনে আমাকে ফিরিয়ে আন্‌বে?

নীলাম্বর বলিল, ছমাসের মধ্যে ফিরিয়ে আন্‌ব, তোকে আমি কথা দিচ্ছি।

আচ্ছা, বলিয়া বিরাজ সম্মত হইল।

দিন চার-পাঁচ পরে গরুর গাড়ী আসিল, মামার বাড়ী হইতে আট-

দশ ক্রোশ এই উপায়েই যাইতে হয়। অথচ বিরাজের ব্যবহারে যাত্রার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

নীলাম্বর ব্যস্ত হইতে লাগিল, তাগিদ দিতে লাগিল।

বিরাজ কাজ করিতে করিতে বলিয়া বসিল, আজ ত আমি যাব না—আমার অসুখ কচ্চে।

নীলাম্বর অবাক্ হইয়া বলিল, অসুখ কচ্চে কি রে?

বিরাজ বলিল, হাঁ, অসুখ কচ্চে—বড্ড অসুখ কচ্চে, বলিয়া মুখ ভার করিয়া পিতলের কলসীটা কাঁকালে তুলিয়া লইয়া নদীতে জল আনিতে চলিয়া গেল। সেদিন গাড়ী ফিরিয়া গেল। রাত্রে অনেক সাধাসাধি অনেক বোঝানোর পর সে দুদিন পরে যাইতে সম্মত হইল। দুদিন পরে আবার গাড়ী আসিল।

নীলাম্বর সংবাদ দিবামাত্রই বিরাজ একেবারে বাঁকিয়া বসিল—না, আমি কক্ষণ যাব না।

নীলাম্বর আরও আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, যাবি নে কেন?

বিরাজ কাঁদিয়া ফেলিল—না, আমি যাব না। আমার গয়না কৈ, আমার ভাল কাপড় কৈ, আমি দীন-দুঃখীর মত কিছুতেই যাব না।

নীলাম্বর রাগিয়া বলিল, আজ তোর গয়না নাই সত্যি, কিন্তু যখন ছিল, তখন একদিন ফিরেও চাস্ নি?

বিরাজ চুপ করিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

নীলাম্বর পুনরায় কহিল, তোর ছল আমি বুঝি। আমার মনে মনে সন্দেহ ছিলই, তবে ভেবেছিলাম, দুঃখে কষ্টে বুঝি তোর হুঁস হয়েছে, তা দেখ্‌ছি কিছুই হয়নি। ভাল তুইও শুকিয়ে মর, আমিও মরি। বলিয়া সে বাহিরে গিয়া গাড়ী ফিরাইয়া দিল।

দুপুর-বেলায় নীলাম্বর ঘরের ভিতরে ঘুমাইতেছিল, পীতাম্বর নিজের কাজে গিয়াছিল, ছোটবৌ বেড়ার ফাঁক দিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়া বলিল,

দিদি, অপরাধ নিও না, তোমাকে আর আমি বোঝাব কি, কিন্তু দুদিন ঘুরে এলে না কেন?

বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিল, ওঁকে বদ্ধ ক'রে রেখো না দিদি, বিপদের দিনে একটিবার বুক বাঁধ, ভগবান দুদিনে মুখ তুলে চাইবেন।

বিরাজ আস্তে আস্তে বলিল, আমি ত বুক বেঁধেই আছি ছোটবৌ!

ছোটবৌ একটু জোর দিয়া বলিল, তবে যাও দিদি, ওঁকে পুরুষমানুষের মত উপার্জ্জন কর্‌তে দাও—আমি বল্‌চি তোমার প্রতি ভগবান দুদিনে প্রসন্ন হবেন।

বিরাজ একবার মুখ তুলিল, কি কথা বলিতে গেল, তার পর মুখ হেঁট করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিল, পার্‌বে না যেতে?

এবার বিরাজ মাথা নাড়িয়া বলিল, না। ঘুম ভেঙে উঠে ওর মুখ না দেখে আমি একটা দিনও কাটাতে পার্‌ব না। যা পার্‌ব না ছোটবৌ, সে কাজ আমাকে ব'ল না, বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই ছোটবৌ হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হইয়া ডাকিয়া বলিল, যেও না দিদি, তোমাকে দিন-কতক এখান থেকে যেতেই হবে—না গেলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইল, এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, ও বুঝেছি—সুন্দরী এসেছিল বুঝি?

ছোটবৌ মাথা নাড়িয়া বলিল, এসেছিল।

তাই চ'লে যেতে ব'ল্‌চ?

তাই বল্‌চি দিদি, তুমি যাও এখান থেকে।

বিরাজ আবার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল; তার পরে বলিল, একটা কুকুরের ভয়ে বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাব?

ছোটবৌ বলিল, কুকুর পাগল হ'লে তাকে ভয় ত কর্‌তেই হয় দিদি! তা ছাড়া তোমার একার জন্যেও নয়, ভেবে দেখ, এই নিয়ে আরও কত কি অনিষ্ট ঘট্‌তে পারে।

বিরাজ আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর উদ্ধতভাবে মুখ তুলিয়া বলিল, না, কোন মতেই যাব না, বলিয়া ছোটবৌকে প্রত্যুত্তরের অবসরমাত্র না দিয়া দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

কিন্তু তাহার যেন ভয় করিতে লাগিল। তাহাদের ঘাটের ঠিক পরপারে দুদিন হইতে আড়ম্বর করিয়া একটা স্নানের ঘাট এবং নদীতে জল না থাকা সত্বেও মাছ ধরিবার মঞ্চ প্রস্তুত হইতেছিল। বিরাজ মনে মনে বুঝিল, এ সব কেন?

নীলাম্বরও একদিন স্নান করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওপারে ঘাট বাঁধলে কারা বিরাজ?

বিরাজ হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, আমি কি জানি? বলিয়াই দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

তাহার ভাব দেখিয়া নীলাম্বর অবাক্ হইয়া গেল; কিন্তু সেই দিন হইতে বিরাজ যখন তখন জল আনিতে যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। হয় অতি প্রত্যূষে, না হয় একটুখানি রাত্রি হইলে তবে সে নদীতে যাইত, এ ছাড়া সহস্র কাজ আট্‌কাইলেও সে ওমুখো হইত না; কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, তাহার প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। অথচ এই অত্যাচার ও অকথ্য ইতরতার বিরুদ্ধে সে স্বামীর কাছেও সাহস করিয়া মুখ খুলিতে পারিল না।

দিন-চারেক পরেই নীলাম্বরই একদিন ঘাট হইতে আসিয়া হাসিয়া বলিল, নূতন জমিদারের সাজ-সরঞ্জাম দেখেছিস্ বিরাজ?

বিরাজ বুঝিতে পারিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল, দেখ্‌চি বৈকি?

নীলাম্বর পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিল, লোকটা পাগল না কি, তাই

আমি ভাব্‌চি। নদীতে দুটো পুঁটীমাছ থাক্‌বার জল নেই, লোকটা সকাল থেকে একটা মস্ত হুইল-বাঁধা ছিপ ফেলে সারা দিন বসে আছে।

বিরাজ চুপ করিয়া রহিল, সে কোন মতেই স্বামীর হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

নীলাম্বর বলিতে লাগিল, কিন্তু এ ত ঠিক নয়। ভদ্রলোকের খিড়কির ঘাটের সাম্‌নে সমস্ত দিন ব'সে থাক্‌লে মেয়ে-ছেলেরাই বা যায় কি ক'রে? আচ্ছা, তোদের নিশ্চয়ই ত ভারি অসুবিধে হচ্ছে?

বিরাজ বলিল, হ'লেই বা কি কর্‌ব?

নীলাম্বর ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, তাই হবে কেন? ছিপ নিয়ে পাগলামি কর্‌বার কি আর জায়গা নেই। না, না, কাল সকালেই আমি কাছারীতে গিয়ে ব'লে আস্‌ব—সখ হয়, উনি আর কোথাও ছিপ নিয়ে ব'সে থাকুন গে; কিন্তু আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে ও সব চল্‌বে না।

স্বামীর কথা শুনিয়া বিরাজ ভীত হইয় উঠিল, ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, না, তোমাকে ও সব বল্‌তে যেতে হবে না; নদী আমাদের একলার নয় যে, তুমি বারণ ক'রে আস্‌বে!

নীলাম্বর বিস্মিত হইয়া বলিল, তুই বলিস্ কি বিরাজ। নাই হ'ল নদী আমার; কিন্তু লোকের একটা ভালমন্দ বিবেচনা থাকবে না? আমি কালই গিয়ে ব'লে আস্‌ব, না শোনে নিজেই ঐ সকল ঘাট-ফাট টান মেরে ভেঙ্গে ফেল্‌ব, তার পরে যা পারে, সে করুক।

কথা শুনিয়া বিরাজ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, তুমি যাবে জমিদারের সঙ্গে বিবাদ কর্‌তে?

নীলাম্বর বলিল, কেন যাব না। বড়লোক ব'লে যা ইচ্ছা অত্যাচার করবে তাই সয়ে থাকতে হবে?

অত্যাচার কর্‌চে, তুমি প্রমাণ করতে পার?

নীলাম্বর রাগিয়া বলিল, আমি এত তর্কের ধার ধারি নে; স্পষ্ট

দেখ্‌চি অন্যায় কর্‌ছে, আর তুই বলিস্ প্রমাণ করতে পার? পারি না পারি সে আমি বুঝব!

বিরাজ এক মুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের পানে স্থিরভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, দেখ, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর। যাদের দুবেলা ভাত জোটে না, তাদের মুখে এ কথা শুন্‌লে, লোকে গায়ে থুথু দেবে।

কিসে?

আর কিসে, তুমি চাও জমিদারের ছেলের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে।

কথাটা এতই রূঢ়ভাবে বিরাজের মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল যে, নীলাম্বর সহ্য করিতে পারিল না, সে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল। চেঁচাইয়া বলিল, তুই আমাকে কুকুর বেড়াল মনে করিস্ যে, যখন তখন সব কথায় ঐ খাবার খোঁটা তুলিস্! কোন্ দিন তোর দুবেলা ভাত জোটে না?

দুঃখে কষ্টে বিরাজের আর পূর্ব্বের ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা ছিল না, সেও জ্বলিয়া উঠিয়া জবাব দিল, মিছে চেঁচিও না। যা ক'রে দুবেলা ভাত জুটচে, সে সব তুমি জান না বটে, কিন্তু জানি আমি, আর জানেন অন্তর্যামী। এই নিয়ে কোন কথা যদি তুমি বল্‌তে যাও ত আমি বিষ খেয়ে মর্‌ব। বলিয়াই মুখ তুলিয়া দেখিল, নীলাম্বরের মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার দুই চোখে একটা বিহ্বল হতবুদ্ধি দৃষ্টি—সে চাহনির সম্মুখে বিরাজ একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। সে আর একটা কথাও না বলিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। সে চলিয়া গেল, তবুও নীলাম্বর তেমনই করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার প্রচণ্ড ক্রোধ না বুঝিয়া একটা অনুচ্চ স্থানের মধ্যে সজোরে মাথা তুলিতে গিয়া তেমনই সজোরে ধাক্কা খাইয়া যেন একেবারে নিস্পন্দ অসাড় হইয়া গেল। কানে তাহার কেবলই বাজিতে লাগিল

বিরাজের শেষ কথাটা—কি করিয়া সংসার চলিতেছে এবং কেবলি মনে পড়িতে লাগিল, সেদিনের সেই অন্ধকার গভীর রাত্রে ঘরের বাহিরে ভূশয্যায় সুপ্ত বিরাজের শ্রান্ত অবসন্ন মুখ। সত্যই ত! সত্যই ত! দিন যে কেমন করিয়া চলিতেছে এবং কেমন করিয়া যে ওই অসহায়া রমণী একাকিনী চালাইতেছে, সে ত তাহার জানিতে বাকি নাই। অনতিপূর্ব্বে বিরাজের শক্ত কথা তীরের মতই তাহার বুকে আসিয়া বিঁধিয়াছিল, কিন্তু যতই সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয়ের সেই ক্ষত, সেই ক্ষোভ শুধু যে মিলাইয়া আসিতে লাগিল তাহা নহে, ধীরে ধীরে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিতে লাগিল। তাহার বিরাজ ত শুধু আজকের বিরাজ নয়, সে যে কতকাল, কত যুগ-যুগান্তরের। তাহার বিচার শুধু ছুটো দিনের ব্যবহারে ছুটো অসহিষ্ণু কথার উপর করা চলে না! সে হৃদয় কি দিয়া পরিপূর্ণ, সে কথা ত তার চেয়ে আর কেউ বেশি জানে না! এইবার তাহার দুই চোখ বাহিয়া দর দর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে অকস্মাৎ দুই হাত জোড় করিয়া ঊর্দ্ধমুখে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, ভগবান, আমার যা আছে সব নাও, কিন্তু আমার একে নিও না! বলিতে বলিতেই একটা প্রচণ্ড ইচ্ছার বেগ সেই মুহূর্ত্তেই।তাহার প্রিয়তমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিবার জন্য তাহাকে যেন একেবারে ঠেলিয়া দিল। সে ছুটিয়া বিরাজের রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ, সে ঘা দিয়া আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, বিরাজ!

বিরাজ মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল, চমকাইয়া উঠিয়া বসিল।

নীলাম্বর বলিল, কি কচ্চিস্ বিরাজ, দোর খোল্।

বিরাজ সভয়ে নিঃশব্দে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর ব্যস্ত হইয়া বলিল, খুলে দে বিরাজ!

এবার বিরাজ কাঁদ কাঁদ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, তুমি মারবে না বল?

মারব!

কথাটা তীক্ষ্ণধার ছুরির মত নীলাম্বরের হৃৎপিণ্ডে গিয়া প্রবেশ করিল, বেদনায়, লজ্জায়, অভিমানে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, সে সংজ্ঞাহীনের মত একটা চৌকাঠ আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিরাজ তাহা দেখিল না; সে না জানিয়া ছুরির উপর ছুরি মারিয়া কাঁদিয়া বলিল, আর আমি এমন কথা কব না—বল, মারবে না।

নীলাম্বর অস্ফুটস্বরে, কোন মতে 'না' বলিতে পারিল মাত্র। বিরাজ সভয়ে ধীরে ধীরে অর্গলমুক্ত করিবামাত্রই নীলাম্বর টলিতে টলিতে ভিতরে ঢুকিয়া চোখ বুজিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। তাহার নিমীলিত চোখের দুই কোণ বাহিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। স্বামীর এমন মুখ ত বিরাজ কোন দিন দেখে নাই, এখন সমস্ত বুঝিল। শিয়রের কাছে উঠিয়া আসিয়া পরম স্নেহে স্বামীর মাথা নিজের ক্রোড়ের উপর তুলিয়া লইয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যার আঁধার ঘরের মধ্যে গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল, তথাপি উভয়ের কেহই মুখ খুলিল না, কথা কহিল না। আঁধার শয্যাতলে দুই জনেই নীরবে স্থির হইয়া রহিল, কিন্তু অন্তরে যে কথাবার্ত্তা স্বামী-স্ত্রীতে হইয়া গেল সে কথা বোধ করি তাহাদের শুধু অন্তর্যামীই শুনিলেন।

৮

তবুও নীলাম্বর ভাবিতেছিল—এ কথা বিরাজ মুখে আনিল কি করিয়া? সে তাহাকে মার-ধোর করিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে এত বড় হীন ধারণা জন্মিল কেন? একে ত সংসারে দুঃখকষ্টের অবধি নাই, তাহার উপর প্রতিদিন এ কি হইতে লাগিল? দুদিন যায় না, বিবাদ বাধে। কথায় কথায় মনোমালিন্য, চোখে চোখে কলহ, পদে পদে মতভেদ হয়। সর্ব্বোপরি তাহার এমন বিরাজ দিন দিন এমন হইয়া যাইতে লাগিল, অথচ কোন দিকে চাহিয়া সে এই দুঃখের সাগরের কিনারা দেখিল না। ভগবানের চরণে নীলাম্বরের অচলা ভক্তি ছিল, অদৃষ্টের লেখায় অসীম বিশ্বাস ছিল, সে সেই কথাই ভাবিতে লাগিল, কাহাকেও মনে মনে দোষ দিল না, কাহারও নিন্দা করিল না—চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে টাঙানো রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির সুমুখে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, ভগবান, যদি এত দুঃখেই ফেল্‌বে মনে ছিল, তবে এত বড় নিরুপায় ক'রে আমাকে গড়্‌লে কেন? সে যে কত নিরুপায়, সে কথা তাহার অপেক্ষা বেশি আর ত কেহই জানে না। লেখাপড়া শিখে নাই, কোন রকমের-কাজকর্ম্ম জানিত না, জানিত শুধু দুঃখীর সেবা করিতে, শিখিয়াছিল শুধু ভগবানের নাম করিতে। তাহাতে পরের দুঃখ ঘুচিত বটে, কিন্তু অসময়ে আজ নিজের দুঃখ ঘুচিবে কি করিয়া? আর তাহার কিছুই নাই—সমস্ত গিয়াছে। তাই দুঃখের জ্বালায় কতদিন সে মনে মনে ভাবিয়াছে, এখানে আর থাকিবে না, বিরাজকে লইয়া যেখানে দুচোখ যায় যাইবে; কিন্তু এই সাত-পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া কোন্ দেব-মন্দিরের দ্বারে বসিয়া, কোন্ গাছের তলায় শুইয়া সে সুখ পাইবে! এই ক্ষুদ্র নদী, এই গাছপালায়

ঘেরা বাড়ী, এই ঘরের বাহিরে আজন্ম পরিচিত লোকের মুখ—সমস্ত ছাড়িয়া সে কোন্ দেশে, কোন্ স্বর্গে গিয়া একটা দিনও বাঁচিবে ! এই বাটীতে তাহার মা মরিয়াছে, এই চণ্ডীমণ্ডপে সে তাহার মুমূর্ষু পিতার শেষ সেবা করিয়া গঙ্গায় দিয়া আসিয়াছে—এইখানে সে পুঁটিকে মানুষ করিয়াছে, তাহার বিবাহ দিয়াছে—এই ঘর-বাড়ীর মায়া সে কেমন করিয়া কাটাইবে ! সে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রুদ্ধস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আর এই কি তাহার সব দুঃখ ? তাহার বোনটিকে কোথায় দিয়া আসিল, তাহার একটা সংবাদ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না ; কতদিন হইয়া গেল, তাহার মুখ দেখে নাই, তাহার সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের 'দাদা' ডাক শুনিতে পায় নাই—পরের ঘরে সে কি দুঃখ পাইতেছে, কত কান্না কাঁদিতেছে, কিছুই সে জানিতে পারে নাই। অথচ বিরাজের কাছে তাহার নামটি করিবার যো নাই। সে তাহাকে মানুষ করিয়াও এমন করিয়া ভুলিতে পারিল, কিন্তু সে ভুলিবে কি করিয়া ? তাহার মায়ের পেটের বোন, হাতে কাঁধে করিয়া বড় করিয়াছে, যেখানে গিয়াছে সঙ্গে করিয়া গিয়াছে—সে জন্য কত কথা, কত উপহাস সহ্য করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই পুঁটিকে কাঁদাইয়া ঘর ছাড়িয়া এক পা যাইতে পারে নাই। এ সব কথা শুধু সে জানে, আর সেই ছোটবোনটি জানে।

বিরাজ জানিয়াও জানে না। একটা কথা পর্য্যন্ত বলে না। পুঁটির সম্বন্ধে সে যেন পাষাণমূর্ত্তির মত একেবারে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছে। সে যে মনে মনে তাহার সেই নিরপরাধিনী বোনটিকে অপরাধী করিয়া রাখিয়াছে, এ চিন্তা তাহাকে শূলের মত বিঁধিত, কিন্তু এ সম্বন্ধে একবিন্দু আলোচনার পথ পর্য্যন্ত ছিল না। কোনও একটা কথা বলিতে গেলেই বিরাজঃথামাইয়া দিয়া বলে, ও কথা থাক্—সে রাজরাণী হ',ক কিন্তু তার কথায় কাজ নেই। এই 'রাজরাণী' কথাটা বিরাজ এমনভাবে উচ্চারণ করিয়া উঠিয়া যাইত যে, নীলাম্বরের বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতে

থাকিত। পাছে তাহার উপর গুরুজনের অভিসম্পাত পড়ে, পাছে কোন অকল্যাণ হয়, এই আশঙ্কায় সে মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিত, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিত, লুকাইয়া 'হরির লুঠ' দিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিত। এমনই করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল।

দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। সে আর থাকিতে না পারিয়া গোপনে একটা টাকা সংগ্রহ করিয়া একখানি কাপড় ও কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া সুন্দরীকে গিয়া ধরিল।

সুন্দরী বসিতে আসন দিল, তামাক সাজিয়া দিল, নীলাম্বর আসন গ্রহণ করিয়া তাহার জীর্ণ মলিন উত্তরীয়ের ভিতর হইতে সেই কাপড়খানি বাহির করিয়া বলিল, তুই তাকে মানুষ করেছিস্ সুন্দরী, যা একবার দেখে আয়। আর সে বলিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া চাদরে চোখ মুছিল।

সুন্দরী ইহাদের কষ্টের কথা জানিত। গ্রামের সকলেই জানিত। কহিল, সে কেমন আছে বড়বাবু?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানি নে?

সুন্দরীর বুদ্ধি বিবেচনা ছিল, সে আর প্রশ্ন করিল না। পরদিন সকালেই যাইবে জানাইতে নীলাম্বর কিছু পাথেয় দিতে গেল, সুন্দরী তাহা গ্রহণ করিল না, কহিল, না বড়বাবু, তুমি কাপড় কিনে ফেলেচ, না হ'লে এও আমি নিয়ে যেতাম না—তোমার মত আমিও যে তাকে মানুষ করেচি।

নীলাম্বরের চোখ দিয়া আবার জল গড়াইয়া পড়িল, সে মুখ ফিরাইয়া ক্রমাগত চোখ মুছিতে লাগিল। এমন একটা সমবেদনার কথা সে কাহারও কাছে পায় নাই। সবাই কহে, সে ভুল করিয়াছে, অন্যায় করিয়াছে, পুঁটি হইতেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! উঠিবার উদ্যোগ করিয়া সে সুন্দরীকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল, যেন এই সব দুঃখকষ্টের কথা পুঁটি কোন মতে না জানিতে পারে।

নীলাম্বর চলিয়া গেল, সুন্দরীও এইবার এক্‌ফোঁটা চোখের জল আঁচলে মুছিল। এই লোকটিকে মনে মনে সবাই ভালবাসিত, সবাই ভক্তি করিত।

সেদিন বিজয়ার অপরাহ্ন, বিরাজ শোবার ঘরে ঢুকিয়া দোর দিল। সন্ধ্যা না হইতেই কেহ খুড়ো বলিয়া বাড়ী ঢুকিল, কেহ নীলুদা বলিয়া বাহির হইতে চীৎকার করিল।

নীলাম্বর শুষ্কমুখে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যথারীতি প্রণাম-কোলাকুলির পর তাহারা বৌঠানকে প্রণাম করিবার জন্য ভিতরের দিকে চলিল।

নীলাম্বরও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দেখিল, বিরাজ রান্নাঘরেও নাই, শোবার ঘরেও দ্বার রুদ্ধ। সে করাঘাত করিয়া ডাকিল, ছেলেরা তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে, বিরাজ।

বিরাজ ভিতর হইতে বলিল, আমার জ্বর হয়েছে—উঠ্‌তে পার্‌ব না।

তাহারা চলিয়া যাইবার খানিক পরেই আবার দ্বারে ঘা পড়িল। বিরাজ জবাব দিল না। দ্বারের বাহিরে মৃদুকণ্ঠে ডাক আসিল, দিদি, আমি মোহিনী—একবারটি দোর খোল।

তথাপি বিরাজ কথা কহিল না।

মোহিনী কহিল, সে হবে না দিদি, সারা রাত এই দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়, সে থাক্‌ব, কিন্তু আজকের দিনে তোমার আশীর্ব্বাদ না নিয়ে যাব না।

বিরাজ উঠিয়া কপাট খুলিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, মোহিনীর বাঁ হাতে এক চুপড়ি খাবার, ডান হাতে ঘটিতে সিদ্ধিগোলা। সে পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিয়া দুই পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, শুধু এই আশীর্ব্বাদ কর দিদি, যেন তোমার মত

হ'তে পারি—তোমার মুখ থেকে আমি আর কোন আশীর্ব্বাদ পেতে চাই নে।

বিরাজ সজল চক্ষু আঁচলে মুছিয়া নিঃশব্দে ছোটবধূর অবনত মস্তকে হাত রাখিল।

ছোটবৌ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আজকের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই, কিন্তু, সে কথা ত তোমাকে বলতে পারলুম না দিদি ; দিদি, তোমার দেহের বাতাস যদি আমার দেহে লেগে থাকে ত সেই জোরে ব'লে যাচ্ছি, আস্‌ছে বছর এমনই দিনে সে কথা বল্‌ব।

মোহিনী চলিয়া গেলে বিরাজ সেই সব ঘরে তুলিয়া রাখিয়া স্থির হইয়া বসিল। মোহিনী যে অহর্নিশ তাহাকে চোখে চোখে রাখে, এ কথা আজ সে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিল। তারপর কত ছেলে আসিল, গেল, বিরাজ আর ঘরে দোর দিল না, এই সব দিয়া আজকের দিনের আচার পালন করিল।

পরদিন সকাল-বেলা সে ক্লান্তভাবে দাওয়ায় বসিয়া শাক বাছিতেছিল, সুন্দরী আসিয়া প্রণাম করিল।

বিরাজ আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিতে বলিল।

সুন্দরী বসিয়াই বলিল, কাল রাত্তির হয়ে গেল, তাই আজ সকালেই বল্‌তে এলুম ; কিন্তু যাই বল বৌমা, এমন জান্‌লে আমি কিছুতেই যেতুম না।

বিরাজ বুঝিতে পারিল না, চাহিয়া রহিল।

সুন্দরী বলিতে লাগিল, বাড়ীতে কেউ নেই—সবাই গেছে পশ্চিমে হাওয়া খেতে। আছে এক বুড়ো পিসি, তার শক্ত শক্ত কথা কি বৌমা, বলে, ফিরিয়ে নিয়ে যা। জামায়ের পর্য্যন্ত একখানা কাপড় পাঠায় নি, শুধু একখানা সুতোর কাপড় নিয়ে পূজোর তত্ত্ব কত্তে এসেচে! তারপর ছোটলোক, চামার, চোখের চামড়া নেই—এ যে কত বল্‌লে, তা আর বলে কি হবে!

বিরাজ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কে কাকে বল্‌লে রে!

সুন্দরী বলিল, কেন আমাদের বাবুকে।

বিরাজ অধীর হইয়া উঠিল। সে কিছুই জানিত না, কিছুই বুঝিল না। কহিল, আমাদের বাবুকে কে বললে তাই বল্‌।

এবার সুন্দরীও কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তাই ত এতক্ষণ বল্‌চি বৌমা! পুঁটির বুড়ো পিস্‌শাউড়ির কি দপ্প, কি তেজ মা, কাপড়খানা নিলে না, ফিরিয়ে দিলে; বলিয়া কাপড়খানি আঁচলের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিল।

এবার বিরাজ সমস্ত বুঝিল। সে একদৃষ্টে বস্ত্রখানির দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার অন্তরে বাহিরে আগুন ধরিয়া গেল।

নীলাম্বর বাহিরে গিয়াছিল, কত বেলায় আসিবে তাহার স্থিরতা নাই, সুন্দরী অপেক্ষা করিতে পারিল না, চলিয়া গেল।

দুপুর-বেলা নীলাম্বর আহার করিতে বসিয়াছিল, বিরাজ ঘরে ঢুকিয়া অদূরে সেই কাপড়খানা রাখিয়া দিয়া বলিল, সুন্দরী ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া দেখিয়াই একেবারে ভয়ে ম্লান হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা যে এমনভাবে বিরাজের গোচরে আসিতে পারে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। এখন কোন প্রশ্ন না করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

বিরাজ কহিল, কেন তারা নিলে না, কেন গালিগালাজ করে ফিরিয়ে দিলে, সে সব কথা সুন্দরীর কাছে গেলেই শুন্‌তে পাবে।

তথাপি নীলাম্বর মুখ তুলিল না, কিংবা একটি কথাও শুনিতে চাহিল না। বিরাজও চুপ করিল।

নীলাম্বরের ক্ষুধাতৃষ্ণা একেবারে চলিয়া গিয়াছিল, সে ভীত অবনত মুখে কেবলই অনুভব করিতে লাগিল—বিরাজ তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং সে দৃষ্টি অগ্নি বর্ষণ করিতেছে।

সন্ধ্যা-বেলা সুন্দরীর ঘরে গিয়া সব কথা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া নীলাম্বর কহিল, পশ্চিমে যখন বেড়াতে গেছে, তখন সে নিশ্চয়ই ভালই আছে, না সুন্দরী ?

সুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ভাল আছে বৈ কি বাবু।

নীলাম্বরের মুখ প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল,—কত বড়টি হয়েছে দেখ্‌লি ?

সুন্দরী হাসিয়া বলিল, দেখা ত হয় নি বাবু ?

নীলাম্বর নিজের প্রশ্নে লজ্জিত হইয়া বলিল, তা বটে, কিন্তু দাসী চাকরের কাছেও শুন্‌লি ত ?

না বাবু! তার পিস্‌শাউড়ী মাগীর যে কথাবার্ত্তা, যে হাত পা নাড়া, তাতে আর জিজ্ঞেস করব কি, পালাতেই পথ পাই নি।

নীলাম্বর ক্ষণকাল ক্ষুব্ধ মুখে স্থির থাকিয়া কহিল, আচ্ছা, পুঁটি আমার রোগা হ'য়ে গেছে, কি একটু মোটাসোটা হয়েচে—তোর কি মনে হয় ?

প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সুন্দরী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সংক্ষেপে কহিল, মোটাসোটাই হ'য়ে থাক্‌বে।

নীলাম্বর আশান্বিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল, শুনে এসেচিস্‌ বোধ করি, না ?

সুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না বাবু, শুনে কিছুই আসি নি।

তবে জান্‌লি কি করে ?

এবার সুন্দরী বিরক্ত হইল, কহিল, জানলুম আর কোথায় ? তুমি বল্‌লে আমার কি মনে হয়, তাই বল্‌লুম, হয়ত মোটাসোটা হয়েচে।

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, তা বটে। তার পর কয়েক মুহূর্ত্ত সুন্দরীর মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আজ তবে যাই সুন্দরী, আর একদিন আসব।

সুন্দরী তখন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বস্তুতঃ তাহার অপরাধ ছিল না।

একে ত বলিবার কিছুই ছিল না, তাহাতে ঘণ্টা-দুই হইতে নিরন্তর এক কথা একশ রকম করিয়া বকিয়া বকিয়াও সে নীলাম্বরের কৌতূহল মিটাইতে পারে নাই।

তাড়াতাড়ি কহিল, হাঁ বাবু, রাত হ'ল আজ এস, আর একদিন সকালে এলে সব কথা হবে।

এতক্ষণে নীলাম্বর সুন্দরীর উৎকণ্ঠিত ব্যস্ততা লক্ষ্য করিল এবং আসি বলিয়া চলিয়া গেল।

সুন্দরীর উৎকণ্ঠার একটা বিশেষ হেতু ছিল।

এই সময়টায় ও-পাড়ার নিতাই গাঙ্গুলী প্রায় প্রত্যহই একবার করিয়া তাহার সংবাদ লইয়া পায়ের ধূলা দিয়া যাইতেন। তাঁহার এই ধূলাটা পাছে মনিবের সাক্ষাতেই পড়ে, এই আশঙ্কায় সে মনে মনে কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল। যদিও নানা কারণে এখন তাহার কপাল ফিরিয়াছে এবং জমিদারের অনুগ্রহে লজ্জা গর্ব্বেই রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছে, তথাপি এই নিষ্কলঙ্ক সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণের সম্মুখে হীনতা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনায় সে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

নীলাম্বর চলিয়া গেলে সে পুলকিত-চিত্তে দ্বার বন্ধ করিতে আসিল, কিন্তু সম্মুখে চাহিতেই দেখিল, নীলাম্বর ফিরিয়া আসিতেছে। সে দোর ধরিয়া বিরক্ত মুখে অপেক্ষা করিয়া রহিল। তাহার মুখে দ্বাদশীর চাঁদের আলো পড়িয়াছিল।

নীলাম্বর কাছে আসিয়া একবার ইতস্ততঃ করিল, তাহার পর চাদরের খুঁট হইতে খুলিয়া একটি আধুলি বাহির করিয়া সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোর কাছে ত বল্‌তে লজ্জা নেই সুন্দরী, সবই জানিস্—এই আধুলিটি শুধু আছে, নে। বলিয়া হাত তুলিয়া দিতে গেল। সুন্দরী জিভ্ কাটিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল।

নীলম্বর বলিল, কত কষ্ট দিলাম—যাওয়া আসার খরচ পর্য্যন্ত দিতে

পারি নি। আর সে বলিতে পারিল না। কান্নায় তাহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল।

সুন্দরী এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, পরক্ষণে হাত পাতিয়া বলিল, দাও। তুমি যাই হও, আমার চিরদিনের মনিব—আমার 'না' বলা সাজে না। বলিয়া আধুলিটি হাতে লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, তবে আর একবার ভিতরে এস, বলিয়া ভিতরে চলিয়া আসিল।

নীলাম্বর পিছনে পিছনে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুন্দরী ঘরে ঢুকিয়া মিনিট-খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া নীলাম্বরের পায়ের কাছে একমুঠা টাকা রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া আছে দেখিয়া, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, অমন ক'রে চেয়ে থাক্‌লে ত হবে না বাবু, আমি চিরকালের দাসী, শুদ্দুর হ'লেও এ জোর শুধু আমারই আছে, বলিয়া হেঁট হইয়া টাকাগুলি তুলিয়া লইয়া চাদরে বাঁধিয়া দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ তোমারই দেওয়া টাকা বাবু, তীর্থ কর্‌ব ব'লে দেবতার নামে তুলে রেখেছিলুম—আর যেতে হ'ল না—দেবতা নিজে ঘরে এসে নিয়ে গেলেন।

নীলাম্বর তখনও কথা কহিতে পারিল না। বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিয়া সে বলিল, বৌমা একলা আছেন, আর না, যাও—কিন্তু একথা তিনি যেন কিছুতেই না জান্‌তে পারেন।

নীলাম্বর কি একটা বলিতে গেলে, সুন্দরী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, হাজার হ'লেও শুনব না বাবু! আজ আমার মান না রাখ্‌লে আমি মাথা খুঁড়ে মরব। তাহার হাতের মধ্যে তখনও চাদরের সেই অংশটা ধরা ছিল, এমন সময়ে 'কি হচ্ছে গো?' বলিয়া নিতাই গাঙ্গুলী খোলা দরজার ভিতর দিয়া একেবারে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী চাদর ছাড়িয়া দিল।

নীলাম্বর বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

নিতাই ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া বলিল, ও ছোঁড়াটা নীলু নয়?

সুন্দরী মনে মনে রাগিয়া উঠিল, কিন্তু সহজভাবে বলিল, হাঁ, আমার মনিব।

শুনি, খেতে পায় না—এত রাত্তিরে যে?

কাজ ছিল, তাই এসেছিলেন।

ও—কাজ ছিল? বলিয়া নিতাই মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। ভাবটা এই যে, তাঁহার মত বয়সের লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ সহজ কর্ম্ম নয়।

সুন্দরীও হাসির অর্থ স্পষ্ট বুঝিল। নিতাইয়ের বয়স পঞ্চাশের উপরে গিয়াছে, মাথার চুল বার আনা পাকিয়াছে—তাহার গোঁফ-দাড়ি কামান, মাথায় শিখা, কপালে সকালের চন্দনের ফোঁটা তখনও রহিয়াছে—সুন্দরী তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সে চাহনির অর্থ বোঝা নিতাইয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই সে কিছু উত্তেজিত হইয়াই বলিয়া উঠিল, অমন ক'রে চেয়ে আছ যে!

দেখ্‌চি।

কি দেখ্‌চ?

দেখ্‌চি তোমরাও বামুন, আর যিনি চ'লে গেলেন, তিনিও বামুন, কিন্তু কি আকাশ-পাতাল তফাৎ!

নিতাই কথাটা বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল, তফাৎ কিসে?

সুন্দরী একটুখানি হাসিয়া বলিল, বুড়ো মানুষ, আর হিমে থেকো না, দাওয়ায় উঠে ব'স। মাইরি বল্‌চি গাঙ্গুলীমশাই, তোমার দিকে চেয়ে ভাবছিলুম, আমার মনিবের পায়ের এক ফোঁটা ধুলো পেলে তোমাদের মত কতগুলি গাঙ্গুলী কত জন্ম উদ্ধার হ'তে পারে।

তাহার কথা শুনিয়া নিতাই ক্রোধে বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য হইয়া চাহিয়া রহিল। সুন্দরী একটা কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে সাজিতে অত্যন্ত সহজভাবে বলিতে লাগিল, রাগ ক'র না ঠাকুর, কথাটা সত্যি। আজ ব'লে নয়, বরাবরই দেখে আসচি ত, মনিবের পৈতে গাছটার দিকে চোখ পড়্‌লে চোখ যেন ঠিক্‌রে যায়—মনে হয় ওর গলার ওপরে যেন আকাশের বিদ্যুৎ খেলা ক'রে বেড়াচ্চে, কিন্তু তোমাদের দেখ—দেখলেই আমার হাসি পায়। বলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রথম হইতেই নিতাই ঈর্ষায় জ্বলিতেছিল, এখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। দুই চোখ আগুনের মত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, অত দর্প করিস নে সুন্দরী, মুখ প'চে যাবে।

সুন্দরী কলিকাটায় ফুঁ দিতে দিতে কাছে আসিয়া সহাস্যে বলিল, কিচ্ছু হবে না—নাও তামাক খাও। বরং তোমার মুখই ম'লে পুড়্‌বে না—আমার দুঃখী মনিবকে দেখে ঐ মুখে হেসেচ!

নিতাই কলিকাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী তাহার উত্তরীয়ের এক অংশ ধরিয়া ফেলিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, ব'স, ব'স, মাথা খাও। ক্রুদ্ধ নিতাই নিজের উত্তরীয় সজোরে টানিয়া লইয়া—গোল্লায় যাও—গোল্লায় যাও—নিপাত যাও, বলিয়া শাপ দিতে দিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

সুন্দরী সেইখানে বসিয়া পড়িয়া খুব খানিকটা হাসিল, তারপর উঠিয়া আসিয়া সদর-দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, কিসে আর কিসে! বামুন বলি ওঁকে। এত দুঃখেও মুখে হাসিটি লেগে রয়েচে, তবু চোখ তুলে চাইতে ভরসা হয় না—যেন আগুন জ্বল্‌চে!

৯

ঠিক কাহার অনুগ্রহে ঘটিয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু কথাটা বিকৃত হইয়া বিরাজের কানে উঠিতে বাকি থাকিল না। সেদিন আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন, ও-বাড়ীর পিসিমা। বিরাজ সমস্ত মন দিয়া শুনিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, ওঁর একটা কান কেটে নেওয়া উচিত পিসিমা!

পিসিমা রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিতে বলিতে গেলেন, জানি ত ওকে—এমন ফাজিল মেয়ে গাঁয়ে আর দুটি আছে কি ?

বিরাজ স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, কবে আবার তুমি সুন্দরীর ওখানে গেলে ?

নীলাম্বর ভয়ে শুষ্ক হইয়া গিয়া জবাব দিল, অনেকদিন আগে পুঁটির খবরটা নিতে গিয়েছিলাম।

আর যেও না। তাঁর স্বভাব-চরিত্র শুনতে পাই ভারী মন্দ হয়েচে, বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল। তারপর কত দিন কাটিয়া গেল। সূর্য্যদেব ওঠেন এবং অস্ত যান, তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার যো নাই বলিয়াই বোধ করি, শীত গেল, গ্রীষ্মও যাই যাই করিতে লাগিল। বিরাজের মুখের উপর একটা গাঢ় ছায়া ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া পড়িতে লাগিল, অথচ চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত এবং খরতর। যে কেহ তাহার দিকে চাহিতে যায়, তাহারই চোখ যেন আপনি ঝুঁকিয়া পড়ে। শূল-বিদ্ধ দীর্ঘ বিষধর শূলটাকে নিরন্তর দংশন করিয়া, শ্রান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িয়া যে ভাবে চাহিয়া থাকে, বিরাজের চোখের দৃষ্টি তেমনই করুণ, অথচ তেমনই ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা প্রায়ই হয় না। তিনি কখন্

চোরের মত আসেন যান, সে দিকে সে যেন দৃষ্টিপাতই করে না। সবাই তাহাকে ভয় করে, শুধু করে না ছোটবৌ। সে সুযোগ পাইলেই যখন তখন আসিয়া উপদ্রব করিতে থাকে। প্রথম প্রথম বিরাজ ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারিয়া উঠে নাই। চোখ রাঙাইলে সে গলা জড়াইয়া ধরে, শক্ত কথা বলিলে পা জড়াইয়া ধরে।

সেদিন দশহরা। অতি প্রত্যূষে ছোটবৌ লুকাইয়া আসিয়া ধরিল, এখনও কেউ উঠেনি দিদি, চল না একবার নদীতে ডুব দিয়ে আসি।

ও-পারে জমিদারের ঘাট তৈরী হওয়া পর্য্যন্ত তাহার নদীতে যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

দুই জায়ে স্নান করিতে গেল। স্নানান্তে জল হইতে উঠিয়াই দেখিল, অদূরে একটা গাছতলায় জমিদার রাজেন্দ্রকুমার দাঁড়াইয়া আছে। সে স্থানটা হইতে তখনও সমস্ত অন্ধকার চলিয়া যায় নাই, তথাপি দুইজনেই লোকটাকে চিনিল। ছোটবৌ ভয়ে জড়সড় হইয়া বিরাজের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজ অতিশয় বিস্মিত হইল। এত প্রভাতে লোকটা আসিল কিরূপে? কিন্তু পরক্ষণেই একটা সম্ভাবনা তাহার মনে উঠিল, হয়ত সে প্রত্যহ এমন করিয়াই প্রহরা দিয়া থাকে! মুহূর্ত্তের এক অংশ মাত্র বিরাজ দ্বিধা করিল, তারপর ছোটজায়ের একটা হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, দাঁড়াস্ নে ছোটবৌ, চ'লে আয়!

তাহাকে পাশে লইয়া দ্রুতপদে দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া হঠাৎ সে কি ভাবিয়া থামিল, তারপর ধীরপদে ফিরিয়া গিয়া রাজেন্দ্রর অদূরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল। অস্পষ্ট আলোকেও সে দৃষ্টি রাজেন্দ্র সহিতে পারিল না, মুখ নামাইল।

বিরাজ বলিল, আপনি ভদ্রসন্তান, বড়লোক, এ কি প্রবৃত্তি আপনার!

রাজেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল—জবাব দিতে পারিল না।

বিরাজ বলিতে লাগিল, আপনার জমিদারী যত বড়ই হউক, যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন সেটা আমার। হাত দিয়া ও-পারের ঘাটটা দেখাইয়া বলিল, আপনি যে কত বড় ইতর, তা ঐ ঘাটের প্রত্যেক কাঠের টুক্‌রোটা পর্য্যন্ত জানে, আমিও জানি। বোধ করি আপনার মা বোন নেই। অনেক দিন আগে আমার দাসীকে দিয়ে এখানে ঢুক্‌তে নিষেধ করেছিলাম, তা আপনি শোনেন নি।

রাজেন্দ্র এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তখনও কথা কহিতে পারিল না।

বিরাজ বলিল, আমার স্বামীকে আপনি চেনেন না, চিন্‌লে কখনই আসতেন না। তাই আজ ব'লে দিচ্চি, আর কখনও আস্‌বার পূর্ব্বে তাঁকে চেন্‌বার চেষ্টা করে দেখবেন, বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বাড়ীতে ঢুকিতে যাইতেছে, দেখিল পীতাম্বর একটা গাড়ু হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বহু দিন হইতেই তাহার সহিত বাক্যালাপ ছিল না, তথাপি সে ডাকিয়া বলিল, বৌঠান্‌, যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইছিলে সেই ওই জমিদারবাবু না?

চক্ষের নিমেষে বিরাজের চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠিল; সে 'হাঁ' বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ঘরে গিয়া নিজের কথা সে তখনই ভুলিল, কিন্তু ছোটবৌর জন্য মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কেবলই ভাবিতে লাগিল, কি জানি, তাহাকে ঠাকুরপো দেখিতে পাইয়াছে কি না; কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, মিনিট-দশেক পরে ও-বাড়ী হইতে একটা মারের শব্দ ও চাপা কান্নার আর্ত্তস্বর উঠিল।

বিরাজ ছুটিয়া আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়া পড়িল।

নীলাম্বর এইমাত্র ঘুম ভাঙিয়া বাহিরে আসিয়া মুখ ধুইতেছিল; পীতাম্বরের তর্জ্জন ও প্রহারের শব্দ মুহূর্ত্তকাল কান পাতিয়া শুনিল এবং পরক্ষণেই বেড়ার কাছে আসিয়া লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ও-বাড়ীতে গিয়া দাঁড়াইল।

বেড়া ভাঙ্গার শব্দে পীতাম্বর চমকিয়া মুখ তুলিয়া সুমুখেই যমের মত বড়ভাইকে দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া থামিল।

নীলাম্বর ভূ-শায়িত ছোটবধূকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ঘরে যাও মা, কোন ভয় নেই।

ছোটবৌ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া গেলে নীলাম্বর সহজভাবে বলিল, বৌমার সাম্‌নে আর তোর অপমান কর্‌ব না, কিন্তু এই কথাটা আমার ভুলেও অবহেলা করিস্ নে যে, আমি যতদিন ও-বাড়ীতে আছি, ততদিন এ সব চল্‌বে না। যে হাতটা ওর গায়ে তুল্‌বি, তোর সেই হাতটা আমি ভেঙে দিয়ে যাব। বলিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল।

পীতাম্বর সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়া উঠিল, বাড়ী চ'ড়ে মার্‌তে এলে কিন্তু কারণ জান?

নীলাম্বর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, জানতেও চাই নে।

পীতাম্বর বলিল, তা চাইবে কেন? আমাকে দেখছি তা হ'লে নিতান্তই ভিটে ছেড়ে পালাতে হ'বে!

নীলাম্বর তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, পরে বলিল, ভিটে ছেড়ে কাকে পালাতে হ'বে, সে আমি জানি—তোকে মনে ক'রে দিতে হ'বে না; কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ তোকে সবুর ক'রে থাক্‌তেই হ'বে। সেই কথাটাই তোকে জানিয়ে গেলাম। বলিয়া আবার ফিরিবার উপক্রম করিতেই পীতাম্বর সহসা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, তবে তোমাকেও জানিয়ে দিই দাদা! পরকে শাসন কর্‌বার আগে ঘর শাসন করা ভাল।

নীলাম্বর চাহিয়া রহিল, পীতাম্বর সাহস পাইয়া বলিতে লাগিল, ও-পারের ঘাটটা কার জান ত? বেশ। আমি সেই থেকে ছোটবৌকে ঘাটে যেতে মানা ক'রে দিই। আজ রাত থাকতে উঠে বৌঠানের সঙ্গে নাইতে গিয়েছিলেন—এমনই হয়ত রোজই যান, কে জানে?

নীলাম্বর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, এই দোষে গায়ে হাত তুললি?

পীতাম্বর বলিল, আগে শোন। ওই জমিদারের ছেলের—কি জানি রাজেনবাবু না কি নাম ওর—দেশ-বিদেশে সুখ্যাতি ধরে না। আজ যে বৌঠান তার সঙ্গে আধ ঘণ্টা ধ'রে গল্প কর্‌ছিলেন, কেন?

নীলাম্বর বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, কে কথা কইছিল রে? বিরাজ-বৌ?

হাঁ, তিনিই।

তুই চোখে দেখেছিস্।

পীতাম্বর মুখের ভাবটা হাসিবার মত করিয়া বলিল, তুমি আমাকে দেখ্‌তে পার না জানি—আমার সে বিচার নারায়ণ কর্‌বেন—কিন্তু—

নীলাম্বর ধম্‌কাইয়া উঠিল—আবার ঐ নাম মুখে আনে! কি বল্‌বি বল।

পীতাম্বর চমকিয়া উঠিয়া ঈষৎ হাসিয়া রুষ্টস্বরে বলিতে লাগিল, চোখে না দেখে কথা কওয়া আমার অভ্যাস নয়। ঘর শাসন না করতে পার, পরকে তেড়ে মার্‌তে এস না।

নীলাম্বরের মাথার উপর অকস্মাৎ যেন বাড়ি পড়িল। ক্ষণকাল উদ্‌ভ্রান্তের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে প্রশ্ন করিল, আধ ঘণ্টা ধরে গল্প কর্‌ছিল, কে বিরাজ-বৌ? তুই চোখে দেখেছিস্? পীতাম্বর দু-এক পা ফিরিয়া গিয়াছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, চোখেই দেখেচি। আধ ঘণ্টার হয়ত বেশিও হতে পারে।

আবার নীলাম্বর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া বলিল, ভাল, তাই যদি হয় কি করে জান্‌লি তার কথা কইবার আবশ্যক ছিল না?

পীতাম্বর মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, সে কথা জানি নে, তবে আমার মার-ধোর করা উচিত হয় নি, কেন না ঘাট তৈরি ছোটবৌর জন্য হয় নি।

মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় নীলাম্বর দুই হাত তুলিয়া ছুটিয়া আসিয়াই থামিয়া পড়িল, তৎপরে পীতাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তুই জানোয়ার, তাতে ছোটভাই। বড়ভাই হ'য়ে আমি আর তোকে অভিসম্পাত করব না, আমি মাপ করলুম, কিন্তু আজ তুই যে কথা গুরুজনকে বল্‌লি, ভগবান তোকে মাপ করবেন না—যা, বলিয়া সে ধীরে ধীরে এ-ধারে চলিয়া আসিয়া ভাঙা বেড়াটা নিজেই বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

বিরাজ কান পাতিয়া সমস্ত শুনিল। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার আপাদ-মস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিতেছিল, একবার ভাবিল, সাম্‌নে গিয়া নিজের সব কথা বলে, কিন্তু পা বাড়াইতেই পারিল না। তাহার রূপের উপর পর-পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি পড়িয়াছে, স্বামীর সুমুখে একথা নিজের মুখে সে কি করিয়া উচ্চারণ করিবে!

বেড়া বাঁধিয়া দিয়া নীলাম্বর বাহিরে চলিয়া গেল।

দুপুর-বেলা ভাত বাড়িয়া দিয়া বিরাজ আড়ালে বসিয়া রহিল, রাত্রে স্বামী ঘুমাইয়া পড়িলে নিঃশব্দে শয্যায় আসিয়া প্রবেশ করিল এবং প্রভাতে তাঁহার ঘুম ভাঙিবার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গেল।

এম্‌নিই করিয়া পলাইয়া বেড়াইয়া যখন দুদিন কাটিয়া গেল, অথচ, নীলাম্বর কোন প্রশ্ন করিল না, তখন আর এক ধরণের আশঙ্কা তাহার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল। স্ত্রী সম্বন্ধে এত বড় অপবাদের কথায় স্বামীর মনে কৌতূহল জাগে না, ইহার কোন সঙ্গত হেতু সে খুঁজিয়া পাইল না; কিম্বা ঘটনাটায় তিনি বিস্মিত হইয়াছেন, এ সম্ভাবনাও তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। এ দুই দিন একদিকে যেমন সে গা ঢাকিয়া ফিরিয়াছে, অপর দিকে তেমনই অনুক্ষণ আশা করিয়াছে, এইবার কথা উঠিবে, এইবার তিনি ডাকিয়া ঘটনাটি জানিতে

চাহিবেন। তাহা হইলেই সে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিয়া স্বামীর পায়ের নিচে তাহার বুকের ভারী বোঝাটা নামাইয়া ফেলিয়া সুস্থ হইয়া বাঁচিবে, কিন্তু কৈ কিছুই যে হইল না! স্বামী নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

একবার সে ভাবিবার চেষ্টা করিল, হয়ত কথাটা তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু এই তাহার সম্পূর্ণ আত্মগোপন করাটাও কি তাঁহার চোখে পড়িয়া সংশয় উদ্রেক করিতেছে না? অথচ, যাহা এতদিন পর্য্যন্ত সে গোপন করিয়া আসিয়াছে, তাহা নিজেই বা আজ যাচিয়া বলিবে কিরূপে? সে দিনটাও এমনি করিয়া কাটিল। পরদিন সকালে ভয়ার্ত্ত ভয়াতুর হৃদয় লইয়া সে কোনমতে ঘরের কাজ করিতেছিল, হঠাৎ ভয়ঙ্কর কথা তাহার বুকের গভীর তলদেশ আলোড়িত করিয়া ঘূর্ণাবর্ত্তের মত বাহির হইয়া আসিল, আর যদি ঠাকুরপোর কথা বিশ্বাস করিয়াই থাকেন, তা হ'লে?

নীলাম্বর আহ্নিক শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিতে যাইতেছিল, সে ঝড়ের মত সুমুখে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

বিস্মিত নীলাম্বর মুখ তুলিতেই বিরাজ সজোরে নিজের অধর দংশন করিয়া বলিয়া উঠিল, কেন কি করেচি? কথা কও না যে বড়?

নীলাম্বর হাসিল। বলিল, পালিয়ে বেড়ালে কথা কই কার সঙ্গে?

পালিয়ে বেড়াচ্চি! তুমি ডাকতে পার নি একবার?

নীলাম্বর বলিল, যে লোক পালিয়ে বেড়ায়, তাকে ডাকলে পাপ হয়!

পাপ হয়! তা হ'লে ঠাকুরপোর কথা তুমি বিশ্বাস করেচ বল?

সত্যি কথা বিশ্বাস করব না!

বিরাজ রাগে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল, অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল, সত্যি নয়, ভয়ঙ্কর মিছে কথা! কেন তুমি বিশ্বাস করলে?

তুমি নদীর ধারে কথা বল নি?

বিরাজ উদ্ধতভাবে জবাব দিল, হাঁ বলেচি।

নীলাম্বর বলিল, আমি ঐ টুকুই বিশ্বাস করেচি।

বিরাজ হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, যদি বিশ্বাস করেচ, তবে ঐ ইতরটার মত শাসন করলে না কেন?

নীলাম্বর আবার হাসিল। সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের মত নির্ম্মল হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল। ডান হাত তুলিয়া বলিল, তবে কাছে আয়, ছেলে-বেলার মত আর একবার কান মলে দিই।

চক্ষের পলকে বিরাজ সুমুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং পরক্ষণেই তাঁহার বুকের উপরে সজোরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলাম্বর কাঁদিতে নিষেধ করিল না। তাহার নিজের দুই চোখও জলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল, সে স্ত্রীর মাথার উপরে নিঃশব্দে ডান হাত রাখিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণে কান্নার প্রথম বেগ কমিয়া আসিলে সে মুখ না তুলিয়াই বলিল, কি তাকে বলেছিলুম জান?

নীলাম্বর সস্নেহে মৃদুস্বরে বলিল, জানি, তাকে আসতে বারণ করে দিয়েচো।

কে তোমাকে বললে?

নীলাম্বর সহাস্যে কহিল, কেউ বলে নি; কিন্তু একটা অচেনা লোকের সঙ্গে যখন কথা কয়েচ, তখন অনেক দুঃখেই কয়েচ। সে কথা ও ছাড়া আর কি হতে পারে বিরাজ?

বিরাজের চোখ দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল।

নীলাম্বর বলিতে লাগিল, কিন্তু কাজটা ভাল কর নি। আমাকে জানান উচিত ছিল, আমি গিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতাম। আমি অনেক দিন পূর্ব্বে তার মনের ভাব টের পেয়েছি, কতদিন সকালে বিকালে তাকে দেখতেও পেয়েছি, কিন্তু তোমার নিষেধ মনে করেই কোন দিন কিছু বলি নি।

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশে মেঘ করিয়া টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে বিছানায় শুইয়া আবার কথা উঠিল।

নীলাম্বর বলিল, আজ সারাদিন তাকে দেখবার প্রতীক্ষাতেই ছিলাম।

বিরাজ ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল, কেন?—কেন?

দুটো কথা না বল্‌লে ভগবানের নিকট অপরাধী হয়ে থাক্‌তে হবে,তাই।

ভয়ে উত্তেজনায় বিরাজ উঠিয়া বসিয়া বলিল,না সে হ'বে না, কিছুতেই হ'বে না; এই নিয়ে তুমি তাকে একটি কথাও বলতে পাবে না।

তাহার মুখ চোখের ভাব লক্ষ্য করিয়া নীলাম্বর অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, আমি স্বামী, আমার কি একটা কর্ত্তব্য নেই?

বিরাজ কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই বলিয়া বসিল, স্বামীর অন্য কর্ত্তব্য আগে কর, তার পরে এ কর্ত্তব্য কর্‌তে যেও।

কি? বলিয়া নীলাম্বর ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে 'আচ্ছা' বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইল।

বিরাজ তেমনি ভাবে স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি কথা সহসা তাহার মুখ দিয়া আজ বাহির হইয়া গেল!

বাহিরে বর্ষার প্রথম বারিপাতের মৃদু শব্দে খোলা জানালার ভিতর দিয়া ভিজামাটির গন্ধ বহিয়া আসিতে লাগিল, ভিতরে স্বামী-স্ত্রী নির্ব্বাক স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে নীলাম্বর গভীর আর্ত্তকণ্ঠে কতকটা যেন নিজের মনেই বলিল, আমি যে কত অপদার্থ বিরাজ, তা তোর কাছে যেমন শিখি, তেমন আর কারও কাছে নয়।

বিরাজ কি কথা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার গলা দিয়া শব্দ ফুটিল না। বহুদিন পরে আজ এই অসহ্য দুঃখদৈন্যপীড়িত দম্পতীটির সন্ধির সূত্রপাতেই আবার তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

মধ্যাহ্নে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া ছোটবৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বিরাজের পায়ের নিচে আসিয়া পড়িল। স্বামীর অপরাধের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া এই দুই দিন ধরিয়া সে অনুক্ষণ এই সুযোগটুকু প্রতীক্ষা করিতেছিল। কাঁদিয়া বলিল, শাপ সম্পাত দিও না দিদি, আমার মুখ চেয়ে ওঁকে মাপ কর, ওঁর কিছু হ'লে আমি বাঁচব না।

বিরাজ হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া বিষণ্ণ গভীর মুখে বলিল, আমি অভিসম্পাত দেব না বোন, আমার অনিষ্ট করবার সাধ্যও ওর নেই, কিন্তু তোর মত সতী লক্ষ্মীর দেহে বিনা দোষে হাত তুল্‌লে মা দুর্গা সহ্য করবেন না যে!

মোহিনী শিহরিয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া বলিল, কি করব দিদি, ঐ তাঁর স্বভাব। যে দেবতা ওঁর দেহে অমন রাগ দিয়েছেন, তিনিই মাপ করবেন। তবুও এমন দেব-দেবতা নেই যে, এ জন্য মানত করি নি, কিন্তু মহাপাপী আমি; আমার ডাকে কেউ কান দিলেন না। এমন একটা দিন যায় না দিদি, বলিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল।

বিরাজ এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই যে, ছোটবৌর ডান রগের উপর একটা বাঁকা গাঢ় কাল দাগ পড়িয়াছে, সভয়ে বলিয়া উঠিল, তোর কপালে কি মারের দাগ না কি রে?

ছোটবৌ লজ্জিত-মুখ হেঁট করিয়া ঘাড় নাড়িল।

কি দিয়ে মার্‌লে? স্বামীর লজ্জায় মোহিনী মুখ তুলিতে পারিতেছিল না, নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল, রাগ হ'লে ওঁর জ্ঞান থাকে না দিদি।

তা জানি, কি দিয়ে মার্‌লে?

মোহিনী তেমনই নতমুখে থাকিয়াই বলিল, পায়ে চটি জুতা ছিল—

বিরাজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—তাহার দুই চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। খানিক পরে চাপা বিকৃত কণ্ঠে বলিল, কি করে সহ্য করে রইলি ছোটবৌ?

ছোটবৌ একটুখানি মুখ তুলিয়া বলিল, আমার অভ্যাস হয়ে গেছে দিদি।

বিরাজ সে কথা যেন কানেই শুনিতে পাইল না, বিকৃত গলায় বলিল, আবার তারই জন্য তুই মাপ চাইতে এলি?

ছোটবৌ বড়জার মুখপানে চাহিয়া বলিল, হাঁ দিদি! তুমি প্রসন্ন না হ'লে ওঁর অকল্যাণ হ'বে। আর সহ্য করার কথা যদি বল্‌লে দিদি, সে তোমার কাছেই শেখা, আমার যা কিছু সবই তোমার পায়ে—

বিরাজ অধীর হইয়া উঠিল,—না ছোটবৌ, না, মিছে কথা বলিস্ নে—এ অপমান, আমি সইতে পারি নে।

ছোটবৌ একটুখানি হাসিয়া বলিল, নিজের অপমান সইতে পারাটাই কি খুব বড় পারা দিদি? তোমার মত স্বামী-সৌভাগ্য সংসারে মেয়েমানুষের অদৃষ্টে জোটে না, তবুও তুমি যা সয়ে আছ সে সইতে গেলে আমরা গুঁড়ো হয়ে যাই। তাঁর মুখে হাসি নেই, মনের ভিতর সুখ নেই, তোমাকে রাত দিন চোখে দেখতে হচ্চে; অমন স্বামীর অত কষ্ট সহ্য কর্‌তে তুমি ছাড়া আর কেউ পার্‌ত না দিদি।

বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোটবৌ খপ্ করিয়া হাত দিয়া তাহার পা দুটো চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বল, ওঁকে ক্ষমা কর্‌লে? তোমার মুখ থেকে না শুন্‌লে আমি কিছুতেই ছাড়ব না—তুমি প্রসন্ন না হ'লে ওঁকে কেউ রক্ষে কর্‌তে পারবে না দিদি।

বিরাজ পা সরাইয়া লইয়া হাত দিয়া ছোটবৌর চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিল, মাপ করলুম।

ছোটবৌ আর একবার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আনন্দিত মুখে চলিয়া গেল।

কিন্তু বিরাজ অভিভূতের মত সেইখানে বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কে যেন বার বার ডাক দিয়া বলিতে লাগিল, 'এই দেখে শেখ্ বিরাজ!'

সেই অবধি অনেকদিন পর্য্যন্ত ছোটবৌ এ-বাড়ীতে আসে নাই বটে, কিন্তু একটি চোখ, একটি কান এই দিকেই পাতিয়া রাখিয়াছিল। আজ বেলা একটা বাজে, সে অতি সাবধানে এ-দিকে ও-দিকে চাহিয়া এ-বাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বিরাজ গালে হাত দিয়া রান্নাঘরের দাওয়ার একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল।

ছোটবৌ কাছে বসিয়া পায়ে হাত দিয়া নিজের মাথায় স্পর্শ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, দিদি কি পাগল হয়ে যাচ্চ?

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া তীব্র কণ্ঠে উত্তর করিল, তুই হতিস্ নে?

ছোটবৌ বলিল, তোমার সঙ্গে তুলনা ক'রে আমাকে অপরাধী ক'র না দিদি, এই দুটি পা'র ধূলার যোগ্যও ত আমি নই, কিন্তু তুমি বল, কেন এমন হচ্চ? কেন বট্‌ঠাকুরকে আজ খেতে দিলে না?

আমি ত খেতে বারণ করি নি!

ছোটবৌ বলিল, বারণ কর নি সে কথা ঠিক, কিন্তু কেন একবার গেলে না? তিনি খেতে বসে কতবার ডাকলেন, একটা সাড়া পর্য্যন্ত দিলে না। আচ্ছা তুমিই বল, এতে দুঃখ হয় কি না? একটিবার কাছে গেলে ত তিনি ভাত ফেলে উঠে যেতেন না।

তথাপি বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিতে লাগিল,'হাত জোড়া ছিল' ব'লে আমাকে ত ভুলাতে পারবে না দিদি! চিরকাল সমস্ত কাজ ফেলে রেখে তাঁকে সুমুখে ব'সে

খাইয়েচ—সংসারে এর চেয়ে বড় কাজ তোমার কোন দিন ছিল না, আজ—

কথা শেষ না হইবার পূর্ব্বেই বিরাজ উন্মাদের মত তাহার একটা হাত ধরিয়া সজোরে টান দিয়া বলিল,'তবে দেখ্‌বি আয়। বলিয়া টানিয়া আনিয়া রান্নাঘরেরমাঝখানেদাঁড় করাইয়াহাত দিয়া দেখাইয়া বলিল,ঐ চেয়ে দেখ্‌!

ছোটবৌ চাহিয়া দেখিল, একটা কাল পাথরে অপরিস্কৃত মোটা চালের ভাত এবং তাহারই একধারে অনেকটা কলমি শাকসিদ্ধ, আর কিছুই নাই।

আজ কোন উপায় না দেখিয়া বিরাজ এইগুলি নদী হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া সিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে ছোটবৌর দুচোখ বাহিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, কিন্তু বিরাজের চোখে জলের আভাস মাত্র নাই। দুই জায়ে নিঃশব্দে মুখোমুখি চাহিয়া রহিল।

বিরাজ অবিকৃতকণ্ঠে বলিল, তুইও ত মেয়েমানুষ, তোকেও ত রেঁধে স্বামীর পাতে ভাত দিতে হয়, তুই বল্‌ পৃথিবীতে কেউ কি সুমুখে বসে স্বামীর ওই খাওয়া চোখে দেখ্‌তে পারে? আগে বল্‌, ব'লে, যা তোর মুখে আসে তাই ব'লে আমাকে গাল দে আমি কথা কব না।

ছোটবৌ একটি কথাও বলিতে পারিল না, তাহার চোখ দিয়া তেমনই অঝোরে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিরাজ বলিতে লাগিল, দৈবাৎ রান্নার দোষে যদি কোন দিন তাঁর একটি ভাতও কম খাওয়া হয়েছে ত সারাদিন বুকের ভিতর আমার কি ছুঁচ বিঁধচে, সে আর কেউ জানে না, তুই ত জানিস্‌ ছোটবৌ, আজ তাঁর ক্ষিদের সময় আমাকে ঐ এনে দিতে হয়—তাও বুঝি আর জোটে না—আর সে সহ্য করিতে পারিল না, ছোটজার বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তার

পর, সহোদরার মত এই দুই রমণী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিল, বহুক্ষণ ধরিয়া এই দুটি অভিন্ন নারীহৃদয় নিঃশব্দে অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তার পর বিরাজ মাথা তুলিয়া বলিল, না, তোকে লুকোব না, কেন না, আমার দুঃখ বুঝতে তুই ছাড়া আর কেউ নেই। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমি স'রে না গেলে ওঁর কষ্ট যাবে না; কিন্তু, থেকে ত ও-মুখ না দেখে একটা দিনও কাটাতে পারব না। আমি যাব, বল্ আমি গেলে ওঁকে দেখবি?

ছোটবৌ চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাবে?

বিরাজের শুষ্ক ওষ্ঠাধরে কঠিন শীতল হাসির রেখা পড়িল, বোধকরি একবার সে দ্বিধাও করিল, তারপর বলিল, কি করে জানব বোন কোথায় যেতে হয়, শুনি ওর চেয়ে পাপ নাকি আর নেই, তা সে যাই হোক্ এ জ্বালা এড়াব ত!

এবার মোহিনী বুঝিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া তাঁহার মুখে হাত চাপিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, ছি ছি, ও কথা মুখে এনো না দিদি! আত্মহত্যার কথা যে বলে, তার পাপ, যে কানে শোনে তার পাপ, ছি ছি, কি হয়ে গেলে তুমি!

বিরাজ হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, তা জানি নে! শুধু জানি ওঁকে আর খেতে দিতে পারছি নে। আজ আমাকে ছুঁয়ে কথা দে তুই যেমন ক'রে পারিস দুই ভায়ে মিল করে দিবি!

কথা দিলুম, বলিয়া মোহিনী সহসা বসিয়া পড়িয়া বিরাজের পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তবে আমাকেও আজ একটা ভিক্ষে দেবে বল?

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, কি?

তবে এক মিনিট সবুর কর আমি আস্ছি, বলিয়া সে পা বাড়াইতেই বিরাজ আঁচল ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, না যাস্ নে। আমি একটি তিল পর্য্যন্ত কারু কাছে নেব না।

কেন নেবে না ?

বিরাজ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, সে কোন মতেই হবে না, আর আমি কারও কিছু নিতে পারব না।

ছোটবৌ ক্ষণেকের জন্ম স্থিরদৃষ্টিতে বড়জার আকস্মিক উত্তেজনা লক্ষ্য করিল, তার পর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া তাঁহাকে জোর করিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া বলিল, তবে শোন দিদি! কেন জানি নে, আগে তুমি আমাকে ভালবাসতে না, ভাল ক'রে কথা কইতে না, সে জন্মে কত যে লুকিয়ে বসে কেঁদেচি, কত দেব-দেবীকে ডেকেছি, তার সংখ্যা নাই। আজ তাঁরাও মুখ তুলে চেয়েছেন, তুমি ছোটবোন ব'লে ডেকেচ। এখন একবার ভেবে দেখ, আমাকে এই অবস্থায় দেখে কিছু না করতে পেলে তুমি কি রকম ক'রে বেড়াতে।

বিরাজ জবাব দিতে পারিল না। মুখ নিচু করিয়া রহিল।

ছোটবৌ উঠিয়া গিয়া অনতিকাল পরে একটা বড় ধামায় সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য পূর্ণ করিয়া আনিয়া নামাইয়া রাখিল।

বিরাজ স্থির হইয়া দেখিতেছিল, কিন্তু সে যখন কাছে আসিয়া তাহার আঁচলের একটা খুঁট তুলিয়া একটা মোহর বাঁধিতে লাগিল, তখন সে আর থাকিতে না পারিয়া সজোরে ঠেলিয়া দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, না, ও কিছুতেই হবে না—ম'রে গেলেও না।

মোহিনী ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, হবে না কেন, নিশ্চয় হবে। এ আমার বট্‌ঠাকুর আমাকে বিয়ের সময় দিয়েছিলেন। বলিয়া আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া আর একবার হেঁট হইয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

মগরার এতদিনের পিতলের কজার কারখানা যেদিন সহসা বন্ধ হইয়া গেল এবং এই খবরটা চাঁড়ালদের সেই মেয়েটি বিরাজকে দিতে আসিয়া ছাঁচ বিক্রির অভাবে নিজের নানাবিধ ক্ষতি ও অসুবিধার বিবরণ অনর্গল বকিতে লাগিল, বিরাজ তখন চুপ করিয়া শুনিল। তার পর একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল মাত্র। মেয়েটি মনে করিল, তাহার দুঃখের অংশী মিলিল না, তাই ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া গেল। হায় রে, অবোধ দুঃখীর মেয়ে! তুই কি করিয়া বুঝিবি, সেইটুকু নিশ্বাসে কি ছিল, সে নীরবতার আড়ালে কি ঝড় বহিতে লাগিল! শান্ত নির্ব্বাক্ ধরিত্রীর অন্তস্থলে কি আগুন জ্বলে, সে বুঝিবার ক্ষমতা তুই কোথায় পাইবি!

নীলাম্বর আসিয়া বলিল, সে কাজ পাইয়াছে। আগামী পূজার সময় হইতে কলিকাতার এক নামজাদা কীর্ত্তনের দলের সে খোল বাজাইবে।

খবর শুনিয়া বিরাজের মুখ মৃতের মত রক্তহীন হইয়া গেল। তাহার স্বামী গণিকার অধীনে, গণিকার সংস্রবে, সমস্ত ভদ্র-সমাজের সম্মুখে গাহিয়া বাজাইয়া ফিরিবে, তবে আহার জুটিবে! লজ্জায় ধিক্কারে সে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া নিষেধ করিতেও পারিল না—আর যে কোন উপায় নাই! সন্ধ্যার অন্ধকারে নীলাম্বর সে মুখের ছবি দেখিতে পাইল না—ভালই হইল।

ভাঁটার টানে জল যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষয়-চিহ্ন তট-প্রান্তে আঁকিতে আঁকিতে দূর হইতে সুদূরে সরিয়া যায়, ঠিক তেমনই করিয়া বিরাজ শুকাইতে লাগিল; অতি দ্রুত অতি সুস্পষ্ট-ভাবে ঠিক তেমনই করিয়া তাহার দেহতটের সমস্ত মলিনতা নিরন্তর অনাবৃত করিয়া দিয়া তাহার দেববাঞ্ছিত অতুল্য যৌবন-শ্রী কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইতে লাগিল। দেহ শুষ্ক, মুখ

ম্লান, দৃষ্টি অস্বাভাবিক—যেন কি একটা ভয়ের বস্তু সে অহরহঃ দেখিতেছে। অথচ তাহাকে দেখিবার কেহ নাই। ছিল শুধু ছোটবৌ, সেও মাসাধিককাল ভায়ের অসুখে বাপের বাড়ী গিয়াছে। নীলাম্বর দিনের-বেলা প্রায়ই ঘরে থাকে না। যখন আসে তখন রাত্রির আঁধার, তাহার দুই চোখ প্রায়ই রাঙা, নিশ্বাস উষ্ণ বহে। বিরাজ সবই দেখিতে পায়, সবই বুঝিতে পারে, কিন্তু কোন কথাই বলে না। বলিতে ইচ্ছাও করে না, তাহার সামান্য কথাবার্ত্তা কহিতেও এমনি ক্লান্তি বোধ হয়।

কয়েকদিন হইল, বিকাল হইতে তাহার শীত করিয়া মাথা ধরিয়া উঠিতেছিল, এই লইয়াই তাহাকে স্তিমিত সন্ধ্যা-দীপটি হাতে করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হইত। স্বামী বাড়ী থাকে না বলিয়া, দিনের-বেলা আর সে প্রায়ই রাঁধিত না, রাত্রে ভাত রাঁধিত, কিন্তু তখন তাহার জ্বর। স্বামীর খাওয়া হইয়া গেলে হাত-পা ধুইয়া শুইয়া পড়িত। এমনই করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল। ঠাকুর-দেবতাকে বিরাজ আর মুখ তুলিয়া চাহিতেও বলে না, পূর্ব্বের মত প্রার্থনাও জানায় না। আহ্নিক শেষ করিয়া গলায় আঁচল দিয়া যখন প্রণাম করে, তখন শুধু মনে মনে বলে, ঠাকুর যে পথে যাচ্ছি, সে পথে যেন একটু শীগ্‌গির ক'রে যেতে পাই।

সেদিন ছিল শ্রাবণের সংক্রান্তি। সকাল হইতে ঘন-বৃষ্টিপাতের আর বিরাম ছিল না। তিনদিন জ্বরভোগের পর বিরাজ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া সন্ধ্যার পর বিছানায় উঠিয়া বসিল। নীলাম্বর বাড়ী ছিল না। পরশু স্ত্রীর এত জ্বর দেখিয়াও তাহাকে শ্রীরামপুরের এক ধনাঢ্য শিষ্যের বাটীতে কিছু প্রাপ্তির আশায় যাইতে হইয়াছে, কিন্তু কথা ছিল, কোনমতেই রাত্রিবাস করিবে না, যেমন করিয়া হউক সেই দিন সন্ধ্যা নাগাদ ফিরিয়া আসিবে। পরশু গিয়াছে, কাল গিয়াছে, আজও যাইতে বসিয়াছে, তাঁহার দেখা নাই। অনেক দিনের পর আজ সমস্ত দিন ধরিয়া বিরাজ যখন তখন কাঁদিয়াছে।

আর কিছুতেই শুইয়া থাকিতে না পারিয়া, সন্ধ্যা জ্বালিয়া দিয়া একটা গামছা মাথায় ফেলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। বর্ষার অন্ধকারের মধ্যে যতদূর পারিল, চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়ে, ভিজা চুলে, চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠায় হেলান দিয়া বসিয়া এতক্ষণ পরে আবার কাঁদিতে লাগিল। কি জানি, তাঁর কি ঘটিল! একে দুঃখে কষ্টে অনাহারে দেহ তাঁহার দুর্ব্বল, তাহাতে পরিশ্রম—কোথাও অসুখ হইয়া পড়িলেন, না গাড়ী-ঘোড়া চাপা পড়িলেন, কি হইল, সর্ব্বনাশ ঘটিল— ঘরে বসিয়া সে কি করিয়া বলিবে, কেমন করিয়া কি উপায় করিবে! আর একটা বিপদ, বাড়ীতে পীতাম্বরও নাই, কাল বৈকালে সে ছোটবৌকে আনিতে গিয়াছে, সমস্ত বাড়ীর মধ্যে বিরাজ একেবারে একা। আবার সে নিজেও পীড়িত। আজ দুপুর হইতে তাহার জ্বর ছাড়িয়াছিল বটে, কিন্তু ঘরে এমন এতটুকু কিছু ছিল না যে সে খায়। দুদিন শুধু জল খাইয়া আছে। জলে ভিজিয়া তাহার শীত করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে কোনমতে হাতে পায়ে ভর দিয়া পৈঠা ছাড়িয়া চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে ঢুকিয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

সদর দরজায় ঘা পড়িল, বিরাজ একবার কান পাতিয়া শুনিল। দ্বিতীয় করাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই 'যাই' বলিয়া চোখের পলকে ছুটিয়া আসিয়া কপাট খুলিয়া ফেলিল। অথচ মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে উঠিয়া বসিতেও পারিতেছিল না।

যে করাঘাত করিতেছিল, সে ও-পাড়ার চাষাদের ছেলে। বলিল, মাঠাকরুণ, দাঠাকুর একটা শুকনা কাপড় চাইলে—দাও।

বিরাজ ভাল বুঝিতে পারিল না, চৌকাঠে ভর দিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কাপড় চাইলেন? কোথায় তিনি?

ছেলেটি জবাব দিল, গোপাল ঠাকুরের বাপের গতি ক'রে এই সবাই ফিরে এলেন যে।

গতি ক'রে? বিরাজ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। গোপাল চক্রবর্ত্তী তাহাদের দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। তাহার বৃদ্ধ পিতা বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিতেছিলেন, দিন-দুই পূর্ব্বে তাঁহাকে ত্রিবেণীতে গঙ্গাযাত্রা করান হইয়াছিল, আজ দ্বিপ্রহরে তিনি মরিয়াছেন, দাহ করিয়া এইমাত্র সকলে ফিরিয়া আসিয়াছে। ছেলেটি সব সংবাদ দিয়া শেষকালে জানাইল, দাদাঠাকুরের মত এ অঞ্চলে কেউ নাড়ী ধর্‌তে পারেনা, তাই তিনিও সেই দিন হ'তে সঙ্গে ছিলেন।

বিরাজ টলিতে টলিতে ভিতরে আসিয়া তাহার হাতে একখানা কাপড় দিয়া শয্যা আশ্রয় করিল।

জনপ্রাণীশূন্য অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাহার স্ত্রী একা, জ্বরে দুশ্চিন্তায় অনাহারে মৃতকল্প, সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও যাহার স্বামী বাহিরে পরোপকার করিতে নিযুক্ত, সেই হতভাগিনীর বলিবার বা কহিবার আর কি বাকি থাকে? আজ তাহার অবসন্ন বিকৃত মস্তিষ্ক তাহাকে বারংবার দৃঢ়স্বরে বলিয়া দিতে লাগিল, বিরাজ, সংসারে তোর কেউ নেই। তোর মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই—স্বামীও নেই। আছে শুধু যম। তাঁর কাছে ভিন্ন তোর জুড়াবার আর দ্বিতীয় স্থান নেই। বাহিরে বৃষ্টির শব্দে, ঝিল্লীর ডাকে, বাতাসের স্বননে কেবল 'নাই' 'নাই' শব্দই তাহার দুই কানের মধ্যে নিরন্তর প্রবেশ করিতে লাগিল। ভাঁড়ারে চাল নেই, গোলায় ধান নেই, বাগানে ফল নেই, পুকুরে মাছ নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই—স্বাস্থ্য নেই—বাড়ীতে ছোটবৌ নেই, সকলের সঙ্গে আজ তাহার স্বামীও নেই। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, কাহারও বিরুদ্ধে বিশেষ কোন ক্ষোভের ভাবও তাহার মনে উঠিল না। এক বৎসর পূর্ব্বে স্বামীর এই হৃদয়হীনতার শতাংশের একাংশ বোধ করি তাহাকে ক্রোধে পাগল করিয়া তুলিত;

কিন্তু আজ কি এক রকমের শুষ্ক অবসাদ তাহাকে অসাড় করিয়া আনিতে লাগিল।

এমনই নির্জ্জীবের মত পড়িয়া থাকিয়া সে কত কি ভাবিয়া দেখিতে চাহিল ভাবিতেও লাগিল, কিন্তু সমস্ত ভাবনাই এলোমেলো! অথচ ইহারই মধ্যে অভ্যাস বশে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—কিন্তু সমস্ত দিন তাঁর খাওয়া হয়নি যে!

আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, ত্বরিত-পদে বিছানা ছাড়িয়া প্রদীপ হাতে ভাঁড়ারে ঢুকিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল, রাঁধিবার মত যদি কোথাও কিছু থাকে; কিন্তু কিছু নাই—একটা কণাও তাহার চোখে পড়িল না। বাহিরে আসিয়া খুঁটি ঠেস দিয়া এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তার পর হাতের প্রদীপ ফুঁ দিয়া নিবাইয়া রাখিয়া খিড়কির কবাট খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। কি নিবিড় অন্ধকার! ভীষণ স্তব্ধতা ঘন গুল্মকণ্টকাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পিচ্ছিল পথ, কিছুই আজ তাহার গতিরোধ করিল না। বাগানের অপর প্রান্তে বনের মধ্যে চাঁড়ালদের ক্ষুদ্র কুটীর, সেই দিকে চলিল। বাহিরে প্রাচীর ছিল না, বিরাজ একেবারে প্রাঙ্গণের উপর দাঁড়াইয়া ডাকিল, তুলসী।

ডাক শুনিয়া তুলসী আলো হাতে বাহিরে আসিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল—এই আঁধারে তুমি কেন মা?

বিরাজ কহিল, চাট্টি চাল দে!

চাল দেব? বলিয়া তুলসী হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। এই অদ্ভুত প্রার্থনার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইল না।

বিরাজ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে তুলসী একটু শীগ্‌গির ক'রে দে।

তুলসী আরও দু-একটা প্রশ্নের পর চাল আনিয়া বিরাজের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, কিন্তু এ মোটা চালে কি কাজ হ'বে মা? এ ত তোমরা খেতে পারবে না!

বিরাজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পারব।

তারপর তুলসী আলো লইয়া পথ দেখাইতে চাহিল। বিরাজ নিষেধ করিয়া বলিল, কাজ নেই, তুই একা ফিরে আসতে পারবি নে। বলিয়া নিমেষের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আজ চাঁড়ালের ঘরে সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, ভিক্ষা করিয়া লইয়া গেল, অথচ এত বড় অপমান তাহাকে তেমন বিঁধিল না—শোক, দুঃখ, অপমান, অভিমান কোন বস্তুরই তীব্রতা অনুভব করিবার শক্তি তাহার দেহে ছিল না।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, নীলাম্বর আসিয়াছে। স্বামীকে সে তিন দিন দেখে নাই, চোখ পড়িবামাত্রই দেহের প্রতি রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত উদ্দাম হইয়া উঠিয়া একটা দুর্নিবার আকর্ষণ প্রচণ্ড গতিতে তাহাকে ক্রমাগত ঐ দিকে টানিতে লাগিল, কিন্তু এখন আর তাহাকে এক পা টলাইতে পারিল না।

তীব্র তড়িৎ সংস্পর্শে ধাতু যেমন শক্তিময় হইয়া উঠে, স্বামীকে কাছে পাইয়া চক্ষের নিমিষে সে তেমনই শক্তিময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি সমস্ত আকর্ষণের বিরুদ্ধে সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

নীলাম্বর একটিবার মাত্র মুখ তুলিয়াই ঘাড় হেঁট করিয়াছিল, সেই দৃষ্টিতেই বিরাজ দেখিয়াছিল, তাঁহার দুই চোখ জবার মত ঘোর রক্তবর্ণ—মড়া পোড়াইতে গিয়া তাহারা যে এই তিন দিন অবিশ্রাম গাঁজা খাইয়াছে সে কথা তাহার অগোচর রহিল না। মিনিট পাঁচ-ছয় এই ভাবে থাকিয়া কাছে সরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাওয়া হয়নি ?

নীলাম্বর বলিল, না।

বিরাজ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া রান্নাঘরে যাইতেছিল, নীলাম্বর সহসা ডাকিয়া বলিল, শোন, এত রাত্তিরে কোথায় গিয়েছিলে ?

বিরাজ দাঁড়াইয়া পড়িয়া এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত: করিয়া বলিল, ঘাটে।

নীলাম্বর অবিশ্বাসের স্বরে বলিল, না, ঘাটে তুমি যাওনি।

তবে যমের বাড়ী গিয়েছিলুম, বলিয়া বিরাজ রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ঘণ্টা-খানেক পরে ভাত বাড়িয়া যখন সে ডাকিতে আসিল, নীলাম্বর তখন চোখ বুজিয়া ঝিমাইতেছিল। অত্যধিক গাঁজার মহিমায় তাহার মাথা তখন উত্তপ্ত এবং বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া পূর্ব্ব প্রশ্নের অনুবৃত্তি স্বরূপে কহিল, কোথায় গিয়েছিলে?

বিরাজ নিজের উদ্যত জিহ্বাকে সজোরে দংশন করিয়া নিবৃত্তি করিয়া শান্তভাবে বলিল, আজ খেয়ে শোও, সে কথা কাল শুনো।

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আজই শুন্‌ব। কোথায় গিয়েছিলে বল?

তাহার জিদের ভঙ্গি দেখিয়া এত দুঃখেও বিরাজ হাসিল, বলিল, যদি না বলি?

বল্‌তেই হবে, বল।

আমি তা কিছুতেই বলব না। আগে খেয়ে শোও তখন শুন্‌তে পাবে।

নীলাম্বর এ হাসিটুকু লক্ষ্য করিল না, দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া মুখ তুলিল—সে চোখে আর আচ্ছন্ন ভাব নাই, হিংসা ও ঘৃণা ফুটিয়া বাহির হইতেছে; ভীষণ কণ্ঠে বলিল, না, কিছুতেই না, কোনমতেই না। না শুনে তোমার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খাব না।

বিরাজ চমকাইয়া উঠিল, বুঝি কালসর্প দংশন করিলেও মানুষ এমন করিয়া চমকায় না। সে টলিতে টলিতে দ্বারের কাছে পিছাইয়া গিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, কি বল্‌লে? আমার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খাবে না?

না, কোনমতেই না।

কেন?

নীলাম্বর চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, আবার জিজ্ঞেস্ কচ্চ, কেন?

বিরাজ নিঃশব্দে স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে বলিল, বুঝেছি! আর জিজ্ঞেস্ কর্‌ব না! আমিও কোন মতে বল্‌ব না, কেন না কাল যখন তোমার হুঁস হ'বে, তখন নিজেই বুঝবে—এখন তুমি তোমাতেই নেই।

নেশাখোর সব সহিতে পারে, পারে না শুধু তাহার বুদ্ধিভ্রষ্টতার উল্লেখ সহিতে। ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, গাঁজা খেয়েচি, এই বল্‌চিস্ ত? গাঁজা আজ আমি নূতন খাইনি যে, জ্ঞান হারিয়েচি। বরং জ্ঞান হারিয়েচিস্ তুই! তুই আর তোতে নেই।

বিরাজ তেমনি মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

নীলাম্বর বলিল, কার চোখে ধূলো দিতে চাস্ বিরাজ? আমার? আমি অতি মূর্খ, তাই সেদিন পীতাম্বরের কোন কথা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু সে ছোটভাই, যথার্থ ভায়ের কাজই করেছিল। নইলে কেন বল্‌তে পারিস্ নে কোথা ছিলি? কেন মিছে কথা বল্‌লি—তুই ঘাটে ছিলি?

বিরাজের তুই চোখ এখন ঠিক পাগলের চোখের মত ধক্ ধক্ করিতে লাগিল, তথাপি সে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া জবাব দিল, মিছে কথা বল্‌ছিলুম এ কথা শুনলে তুমি লজ্জা পাবে, তুঃখ পাবে, হয়ত তোমার খাওয়া হবে না তাই, কিন্তু সে ভয় মিছে—তোমার লজ্জা-সরমও নেই, তুমি আর মানুষও নেই; কিন্তু তুমি মিছে কথা বলনি? একটা পশুরও এত বড় ছল কর্‌তে লজ্জা হ'ত, কিন্তু তোমার হ'ল না! সাধু পুরুষ রোগা স্ত্রীকে ঘরে একা ফেলে কোন্ শিষ্যের বাড়ীতে তিন দিন ধ'রে গাঁজার ওপর গাঁজা খাচ্ছিলে, বল?

নীলাম্বর আর সহিতে পারিল না। বল্‌চি, বলিয়া হাতের কাছের

শূন্য পানের ডিবাটা বিরাজের মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। বড় ডিবা তাহার কপালে লাগিয়া ঝন ঝন করিয়া খুলিয়া নিচে পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের কোণ বাহিয়া ঠোঁটের প্রান্ত দিয়া রক্তে মুখ ভাসিয়া উঠিল।

বিরাজ বাঁ হাতে কপাল টিপিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—আমাকে মারলে ?

নীলাম্বরের ঠোঁট মুখ কাঁপিতে লাগিল, বলিল, না মারিনি ; কিন্তু দূর হ সুমুখ থেকে—ও মুখ আর দেখাস্ নে—অলক্ষ্মী দূর হয়ে যা !

বিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, যাচ্চি। এক পা গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কিন্তু সহ্য হ'বে ত ? কাল যখন মনে পড়বে, জ্বরের উপর আমাকে মেরেচ—তাড়িয়ে দিয়েচ, আমি তিন দিন খাইনি তবু এই অন্ধকারে তোমার জন্যে ভিক্ষা ক'রে এনেচি—সইতে পারবে ত ? এই অলক্ষ্মীকে ছেড়ে থাকতে পারবে ত ?

রক্ত দেখিয়া নীলাম্বরের নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল—সে মূঢ়ের মত চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ আঁচল দিয়া মুছিয়া বলিল, এই এক বছর যাই যাই করচি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে পারিনি। চেয়ে দেখ, দেহে আমার কিছু নেই, চোখে ভাল দেখতে পাইনে, এক পা চলতে পারিনে—আমি যেতুম না, কিন্তু স্বামী হয়ে যে অপবাদ আমাকে দিলে, আর আমি তোমায় মুখ দেখাব না। তোমার পায়ের নিচে মরবার লোভ আমার সব চেয়ে বড় লোভ—সেই লোভটাই আমি কোন মতে ছাড়তে পারছিলুম না—আজ ছাড়লুম, বলিয়া কপাল মুছিতে মুছিতে খিড়কীর খোলা দোর দিয়া আর একবার অন্ধকার বাগানের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

নীলাম্বর কথা কহিতে চাহিল, কিন্তু জিভ নাড়িতে পারিল না। ছুটিয়া পিছনে যাইতে চাহিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না। কোন্ মায়া মন্ত্রে তাহাকে অচল পাথরে রূপান্তরিত করিয়া দিয়া বিরাজ অদৃশ্য হইয়া গেল।

আজ একবার ওই সরস্বতীর দিকে চাহিয়া দেখ ভয় করিবে। বৈশাখের সেই শীর্ণকায়া মৃত্যুপ্রবাহিণী শ্রাবণের শেষ দিনে কি খরবেগে দুই কূল ভাসাইয়া চলিয়াছে! যে কাল পাথরখণ্ডটার উপর এক দিন বসন্ত প্রভাতে দুটি ভাই-বোনকে অসীম স্নেহে সুখে এক হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, সেই কাল পাথরটার উপর বিরাজ আজিকার আঁধার রাত্রে কি হৃদয় লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দাঁড়াইল। নিচে গভীর জলরাশি সুদৃঢ় প্রাচীর ভিত্তিতে ধাক্কা খাইয়া আবর্ত্ত রচিয়া চলিয়াছে, সেই দিকে একবার ঝুঁকিয়া দেখিয়া সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পায়ের নিচে কাল পাথর, মাথার উপর মেঘাচ্ছন্ন কাল আকাশ, সুমুখে কাল জল, চারিদিকে গভীর কৃষ্ণ, স্তব্ধ বনানী—আর বুকের ভিতর জাগিতেছে তাদের চেয়ে কাল আত্ম-হত্যা প্রবৃত্তি। সে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া নিজের আঁচল দিয়া দৃঢ় করিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া নিজের হাত পা বাঁধিতে লাগিল।

১২

প্রত্যূষে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপি টিপি জল পড়িতেছিল। নীলাম্বর খোলা দরজার চৌকাঠে মাথা রাখিয়া কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সহসা তাহার সুপ্তকর্ণে শব্দ আসিল, হাঁ গা, বিরাজ-বৌমা!

নীলাম্বর ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। হয়ত শ্যাম নাম শুনিয়া এমনই কোন এক বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে শ্রীরাধা এমনই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া বসিতেন। সে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, উঠানে দাঁড়াইয়া তুলসী ডাকিতেছে। কাল সমস্ত রাত্রি বনে বনে প্রতি বৃক্ষতলে খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাঁদিয়া ঘণ্টা-খানেক পূর্ব্বে শান্ত ও ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দোরগোড়ায় বসিয়াছিল, তার পর কখন্ ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, মা কোথায় বাবু?

নীলাম্বর হতবুদ্ধির মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তুই তবে কাকে ডাক্‌ছিলি!

তুলসী বলিল, বৌমাকেই ত ডাকছি বাবু। কাল এক পহর রাতে কোথাও কিছু নেই, এই আঁধারে মা গিয়ে আমাদের বাড়ী মোটা চাল চেয়ে আনলে, তাই সকালে দোর খোলা পেয়ে জানতে এলুম, সে চেলে কি কাজ হ'ল?

নীলাম্বর মনে মনে সমস্ত বুঝিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

তুলসী বলিল, এত ভোরে তবে খিড়কি খুল্‌লে কে? তবে বুঝি বৌমা ঘাটে গেছেন, বলিয়া চলিয়া গেল।

নদীর ধারে ধারে প্রতি গর্ত্ত, প্রতি বাঁক, ঝোপ ঝাড় অনুসন্ধান করিতে করিতে সমস্ত দিন অভুক্ত, অস্নাত নীলাম্বর সহসা একস্থানে

থামিয়া পড়িয়া বলিল, এ কি পাগলামি আমার মাথায় চাপিয়াছে! আমি যে সারাদিন খাই নাই, এখনও কি একথা তাহার মনে পড়িতে বাকি আছে? এর পরও সে কি কোথাও কোন কারণে এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে? তবে এ কি অদ্ভুত কাণ্ড সকাল হইতে করিয়া ফিরিতেছি! এ সব চোখের সামনে এমনই সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল যে, তাহার সমস্ত দুশ্চিন্তা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গেল, সে কাদা ঠেলিয়া মাঠ ভাঙ্গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘরের দিকে ছুটিল। বেলা যখন যায় যায়, পশ্চিমাকাশে সূর্য্যদেব ক্ষণকালের জন্য মেঘের ফাঁকে রক্তমুখ বাহির করিয়াছেন, সে তখন বাড়ী ঢুকিয়া সোজা রান্নাঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। মেঝের উপর তখনও আসন পাতা, তখনও গতরাত্রির বাড়াভাত শুকাইয়া পড়িয়া আছে—আরসোলা ইঁদুরে ছুটাছুটি করিতেছে—কেহ মুক্ত করে নাই। সে আঁধারে আঁধারে ঠাহর করে নাই; এখন ভাতের চেহারা দেখিয়াই বুঝিল, ইহাই তুলসীর মোটা চাল, ইহাই অভুক্ত স্বামীর জন্য বিরাজ জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে অন্ধকারে লুকাইয়া ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিল, ইহারই জন্য সে মার খাইয়াছে, অশ্রাব্য কটুকথা শুনিয়া লজ্জায় ধিক্কারে বর্ষার দুরন্ত রাতে গৃহত্যাগ করিয়াছে।

নীলাম্বর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মেয়েমানুষের মত গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে যখন এখনও ফিরিয়া আসে নাই, তখন আর আসিবার কথা ভাবিতে পারিল না। সে স্ত্রীকে চিনিত। সে যে কত অভিমানী, প্রাণ গেলেও সে যে পরের ঘরে আশ্রয় লইতে গিয়া এই কলঙ্ক প্রকাশ করিতে চাহিবে না, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতেছিল বলিয়াই তাহার বুকের ভিতরে এত সত্বর এমন হাহাকার উঠিল। তার পর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই বাহু সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া অবিশ্রাম আবৃত্তি করিতে লাগিল, এ আমি সইতে পারব না বিরাজ, তুই আয়।

সন্ধ্যা হইল, এ বাড়ীতে কেহ দীপ জ্বালিল না, রাত্রি হইল, রান্নাঘরে

কেহ রাঁধিতে প্রবেশ করিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ-মুখ ফুলিয়া গেল, কেহ মুছাইয়া দিল না। দুদিনের উপবাসীকে কেহ খাইতে ডাকিল না। বাহিরে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল, ঘনান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুতের শিখা তাহার মুদিত চক্ষুর ভিতর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া দুর্য্যোগের বার্ত্তা জানাইয়া যাইতে লাগিল, তথাপি সে উঠিয়া বসিল না, চোখ মেলিল না, একভাবে মুখ গুঁজিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সকাল। বাহিরের দিকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, দরজায় একটা গো-শকট দাঁড়াইয়া আছে, ব্যস্ত হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই ছোটবৌ ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া নামিয়া পড়িল। অগ্রজের প্রতি একটা বক্র কটাক্ষ করিয়া পীতাম্বর ওধারে সরিয়া গেল। ছোটবৌ কাছে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেই নীলাম্বর অস্ফুটস্বরে কি একটা আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিতে গিয়া হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিস্মিত ছোটবৌ হেঁট মাথা তুলিতে না তুলিতে সে দ্রুতপদে কোন্ দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ছোটবৌ জীবনে আজ প্রথম স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইল। অশ্রু-ভারাক্রান্ত রক্তাভ চোখ দুটি তুলিয়া বলিল, তুমি কি পাথর দিয়ে তৈরী? দুঃখে কষ্টে দিদি আত্মঘাতী হ'লেন, তবুও আমরা পর হ'য়ে থাকব? তুমি থাক্‌তে পার থাক গে, আমি আজ থেকে ও-বাড়ীর সব কাজ কর্‌ব।

পীতাম্বর চম্‌কাইয়া উঠিল—সে কি কথা?

মোহিনী তুলসীর কাছে যতটুকু শুনিয়াছিল এবং নিজে যাহা অনুমান করিয়াছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত কহিল।

পীতাম্বর সহজে বিশ্বাস করিবার লোক নয়, কহিল, তাঁর দেহ ভেসে উঠ্‌বে ত!

ছোটবৌ চোখ মুছিয়া বলিল, না উঠ্‌তেও পারে। স্রোতে ভেসে

গেছেন, সতী-লক্ষ্মীর দেহ মা-গঙ্গা হয়ত বুকে তুলে নিয়েচেন। তা ছাড়া কে বা সন্ধান করচে, কে বা খুঁজে বেড়িয়েছে বল?

পীতাম্বর প্রথমটা বিশ্বাস করিল না, শেষটা করিল, বলিল, আচ্ছা, আমি খোঁজ করাচ্চি। একটু ভাবিয়া বলিল, বৌঠান মামার বাড়ী চ'লে যান্‌নি ত?

মোহিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, কখ্‌খন না। দিদি বড় অভিমানী, তিনি কোথাও যাননি, নদীতেই প্রাণ দিয়েছেন।

আচ্ছা, তাও দেখছি, বলিয়া পীতাম্বর শুষ্কমুখে বাহিরে চলিয়া গেল, বৌঠানের জন্য আজ হঠাৎ তাহার প্রাণটা খারাপ হইয়া গেল। লোকজন নিযুক্ত করিয়া, একজন প্রজাকে বিরাজের মামার বাড়ী পাঠাইয়া, জীবনে আজ সে প্রথম পুণ্যের কাজ করিল, স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, যদুকে দিয়ে উঠানের বেড়াটা ভাঙিয়ে দাও, আর যা পার কর। দাদার মুখের পানে চাইতে পারা যায় না, বলিয়া গুড় মুখে দিয়া একটু জল খাইয়া দপ্তর বগলে করিয়া কাজে চলিয়া গেল। চার-পাঁচ দিন কামাই হওয়ায় তাহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল।

কাজ করিতে করিতে ছোটবৌ ক্রমাগত চোখ মুছিয়া ভাবিতেছিল, ইনি যে মুখের পানে চাইতে পারেন নাই, সে মুখ না জানি কি হইয়া গিয়াছে!

নীলাম্বর চণ্ডীমণ্ডপের মাঝখানে চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। সুমুখের দেওয়ালে টাঙান রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির পট। এই পটখানি নাকি জাগ্রত। যখন রেলগাড়ী হয় নাই, তখন তাহাদের পিতামহ পায়ে হাঁটিয়া এখানি বৃন্দাবন হইতে আনিয়াছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার সহিত পটখানি মানুষের গলায় কথা কহিত, এ ইতিহাস নীলাম্বর তাহার জননীর কাছে বহুবার শুনিয়াছিল। ঠাকুর দেবতা জিনিসটা তাঁহার কাছে ঝাপ্সা ব্যাপার ছিল না। তেমন করিয়া ডাকার মত ডাকিতে পারিলে এঁরা

যে সুমুখে আসেন, কথা কন, এ সমস্ত তাঁহার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য ছিল। তাই ইতিপূর্ব্বে গোপনে এই পটখানিকে কথা কহাইবার প্রয়াস সে যে কত করিয়াছে, তাহার অবধি নাই, কিন্তু সফল হয় নাই। অথচ, এই নিষ্ফলতার হেতু সে নিজের অক্ষমতার উপরেই দিয়া আসিয়াছে, এমন সংশয় কোন দিন মনে উঠে নাই, পট সত্যই কথা কহে কি না! লেখা পড়া সে শিখে নাই। বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, তার পর, বিরাজের কাছে রামায়ণ, মহাভারত পড়িতে এবং একটু আধটু চিঠিপত্র লিখিতে শিখিয়াছিল—শাস্ত্র বা ধর্ম্মগ্রন্থের কোন ধার ধারিত না, তাই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা তাহার নিতান্তই মোটা ধরণের ছিল। অথচ এ সম্বন্ধে কোন যুক্তি তর্কও সহিতে পারিত না। ছেলে-বেলায় এই সব লইয়া কখনও বা পীতাম্বরের সহিত কখনও বা বিরাজের সহিত তাহার মারপিট হইয়া যাইত।

বিরাজ তাহার অপেক্ষা মাত্র চার বছরের ছোট ছিল—তেমন মানিত না। একবার সে মার খাইয়া নীলাম্বরের পেট কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিল। শাশুড়ী উভয়কে ছাড়াইয়া দিয়া বিরাজকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, ছি মা, গুরুজনকে অমন করে কামড়ে দিতে নেই।

বিরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, ও আমাকে আগে মেরেছিল। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া শপথ দিয়াছিলেন, বিরাজের গায়ে কখনো যেন সে হাত না তোলে। তখন তাহার বয়স চোদ্দ বৎসর, আজ প্রায় ত্রিশ চলিয়াছে—সে অবধি মাতৃভক্ত নীলাম্বর সেদিন পর্য্যন্ত মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করে নাই।

আজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পুরাতন দিনের এই সব বিস্মৃত কাহিনী স্মরণ করিয়া প্রথমে সে মায়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া তাহার জাগ্রত ঠাকুরকে দুটা সোজা কথায় বিড় বিড় করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছিল, অন্তর্যামী ঠাকুর! তুমি ত সমস্তই দেখতে পেয়েছ! সে যখন এতটুকু অপরাধ করেনি,

তখন সমস্ত পাপ আমার মাথায় দিয়ে তাকে স্বর্গে যেতে দাও। এখানে সে অনেক দুঃখ পেয়ে গেছে, আর তাকে দুঃখ দিও না। তাহার নিমীলিত চোখের কোণ বাহিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। হঠাৎ তাহার ধ্যান ভাঙিয়া গেল।

বাবা!

নীলাম্বর বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, ছোটবৌ অদূরে বসিয়া আছে। তাহার মুখে সামান্য একটু ঘোমটা, সহজকণ্ঠে বলিল, আমি আপনার মেয়ে, বাবা, ভেতরে আসুন, স্নান ক'রে আজ আপনাকে দুটি খেতে হবে।

প্রথমে নীলাম্বর নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল—কত যুগ যেন গত হইয়াছে, তাহাকে কেহ খাইতে ডাকে নাই। ছোটবৌ পুনরায় বলিল, বাবা, রান্না হয়ে গেছে।

এইবার সে বুঝিল। একবার তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, তারপর সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—রান্না হয়ে গেল মা!

গ্রামের সবাই শুনিল, সবাই বিশ্বাস করিল, বিরাজ-বৌ জলে ডুবিয়া মরিয়াছে; বিশ্বাস করিল না শুধু ধূর্ত্ত পীতাম্বর। সে মনে মনে তর্ক করিতে লাগিল, এই নদীতে এত বাঁক, এত ঝোপ ঝাড়, মৃতদেহ কোথাও না কোথাও আট্‌কাইবে। নদীতে নৌকা লইয়া ধারে ধারে বেড়াইয়া তটভূমের সমস্ত বন জঙ্গল লোক দিয়া তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়াও যখন শবের কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না, তখন তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, বৌঠান আর যাই করুক, নদীতে ডুবিয়া মরে নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে একটা সন্দেহ তাহার মনে উঠিয়াছিল, আবার সেই সন্দেহটাই মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল। অথচ কাহারো কাছে বলিবার যো নাই। একবার মোহিনীকে বলিতে গিয়াছিল, সে জিভ কাটিয়া কানে আঙুল দিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তা হ'লে ঠাকুর দেবতাও মিছে, দিনও মিছে, রাতও মিছে। দেওয়ালে টাঙান অন্নপূর্ণার ছবির দিকে চাহিয়া বলিল,

দিদি ওঁর অংশ ছিলেন! এ কথা আর কেউ জানুক আর না জানুক, আমি জানি, বলিয়া চলিয়া গেল।

পীতাম্বর রাগ করিল না—হঠাৎ সে যেন আলাদা মানুষ হইয়া গিয়াছিল।

মোহিনী ভাসুরের সহিত কথা কহিতে সুরু করিয়াছে। ভাত বাড়িয়া দিয়া একটুখানি আড়ালে বসিয়া একটু একটু করিয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া লইল। সমস্ত সংসারের মাঝে শুধু সে জানিল, কি ঘটিয়াছিল, শুধু সেই বুঝিল, কি মর্ম্মান্তিক ব্যথা ওঁর বুকে বিঁধিয়া রহিল।

নীলাম্বর বলিল, মা, যত দোষই ক'রে থাকি না কেন, জ্ঞানে ত করি নি, তবে কি ক'রে সে মায়া কাটিয়ে চ'লে গেল? আর সইতে পারছিল না, তাই কি গেল মা?

মোহিনী অনেক কথা জানিত। একবার ইচ্ছা হইল বলে, দিদি যাবে বলিয়া একদিন স্বামীর ভার তাহার উপরে দিয়াছিল; কিন্তু চুপ করিয়া রহিল।

পীতাম্বর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি দাদার সঙ্গে কথা কও?

মোহিনী জবাব দিল, বাবা বলি, তাই কথা কই।

পীতাম্বর হাসিয়া কহিল, কিন্তু লোকে শুন্‌লে নিন্দে কর্‌বে যে!

মোহিনী রুষ্ট ভাবে বলিল, লোকে আর কি পারে যে কর্‌বে? তাদের কাজ তারা করুক, আমার কাজ আমি করি। এ যাত্রা ওঁকে যদি বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারি ত লোকের নিন্দে আমি মাথায় পেতে নেব। বলিয়া কাজে চলিয়া গেল।

পনর মাস গত হইয়াছে। আগামী শারদীয়া পূজার আনন্দ-আভাষ জলে স্থলে আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অপরাহ্ণ-বেলায় নীলাম্বর একখানা কম্বলের আসনের উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছে। দেহ অত্যন্ত কৃশ, মুখ ঈষৎ পাণ্ডুর, মাথায় ছোট ছোট জটা, চোখে বৈরাগ্য ও বিশ্বব্যাপী করুণা। মহাভারতখানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া বিধবা ভ্রাতৃ-জায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মা, পুঁটিদের বোধ করি আজ আর আসা হ'ল না।

শুভ্র-বস্ত্র পরিহিতা নিরাভরণা ছোটবৌ অনতিদূরে বসিয়া এতক্ষণ মহাভারত শুনিতেছিল, বেলার দিকে চাহিয়া বলিল, না বাবা, এখনও সময় আছে—আস্‌তে পারে। দুর্দ্দান্ত শ্বশুরের মৃত্যুতে পুঁটি এখন স্বাধীন। সে স্বামী ও দাস-দাসী সঙ্গে করিয়া আজ বাপের বাড়ী আসিতেছে এবং পূজার কয় দিন এখানেই থাকিবে বলিয়া খবর পাঠাইয়াছে। আজিও সে কোন সংবাদ জানে না। তাহার মাতৃসমা-বৌদিদি নাই—ছয়মাস পূর্ব্বে সর্পাঘাতে ছোটদাদা মরিয়াছে, কোন কথাই সে জানে না।

নীলাম্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না এলেই বোধ করি ছিল ভাল, একসঙ্গে এতগুলো সে কি সইতে পার্‌বে মা?

প্রিয়তমা ছোটভগিনীকে স্মরণ করিয়া বহুদিন পরে আজ তাহার শুষ্ক চক্ষে জল দেখা দিল। যে রাত্রে পীতাম্বর সর্পদষ্ট হইয়া তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, আমার কোন ওষুধপত্র চাই না দাদা, শুধু তোমার পায়ের ধূলো আমার মাথায় মুখে দাও, এতে যদি না বাঁচি ত আর বাঁচতেও চাইনে, বলিয়া সর্ব্বপ্রকার ঝাড়-ফুঁক সজোরে প্রত্যাখ্যান করিয়া ক্রমাগত তাহার পায়ের নিচে মাথা ঘষিতেছিল এবং বিষের

যাতনায় অব্যাহতি পাইবার আশায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পা ছাড়ে নাই, সেই দিন নীলাম্বর তাহার শেষ কান্না কাঁদিয়া চুপ করিয়াছিল, আজ আবার সেই চোখে জল আসিয়াছে। পতিব্রতা, সাধ্বী ছোটবধূ নিজের চোখের জল গোপনে মুছিয়া নীরব হইয়া রহিল।

নীলাম্বর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, সে জন্যেও তত দুঃখ করিনি মা; আমার পীতাম্বরের মত বিরাজকে যদি ভগবান নিতেন ত আজ আমার সুখের দিন। সে ত হ'ল না। পুঁটি এখন বড় হয়েচে, তার জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েচে, তার মায়ের মতন বৌদির এ কলঙ্ক শুন্‌লে বল ত মা তার বুকের ভিতর কি করতে থাকবে! আর ত সে মুখ তুলে চাইতেও পারবে না।

সুন্দরী আত্মগ্লানি আর সহ্য করিতে না পারিয়া মাস দুই পূর্ব্বে নীলাম্বরের কাছে কবুল করিয়া ফেলিয়াছিল, সে রাত্রে বিরাজ মরে নাই, জমিদার রাজেন্দ্রর সহিত গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সে নীলাম্বরের মনোকষ্ট আর দেখিতে পারিতেছিল না। মনে করিয়াছিল, এ কথায় সে ক্রোধের বশে হয়ত দুঃখ ভুলিতে পারিবে। ঘরে আসিয়া নীলাম্বর এ কথা বলিয়াছিল।

সেই কথা মনে করিয়া ছোটবৌ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, ঠাকুরঝিকে জানিয়ে কাজ নেই।

কি ক'রে লুকোবে মা? যখন জিজ্ঞেস করবে, বৌদির কি হয়েছিল, তখন কি জবাব দিবে?

ছোটবৌ বলিল, যে কথা সকলে জানে, দিদি নদীতে প্রাণ দিয়েছেন—তাই।

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া কহিল, তা হয় না মা। শুনেচি পাপ গোপন কর্‌লেই বাড়ে, আমরা তার আপনার লোক, আমরা তার পাপের ভার আর বাড়িয়ে দেব না। বলিয়া সে একটুখানি হাসিল। সেটুকু হাসিতে কত ব্যথা, কত ক্ষমা, তাহা ছোটবৌ বুঝিল। খানিক পরে ছোটবৌ

অতিশয় সঙ্কুচিত ভাবে, মৃদুস্বরে বলিল, এ সব কথা হয়ত সত্য নয় বাবা।

কোন্ সব কথা মা? তোমার দিদির কথা?

ছোটবৌ নতমুখে মৌন হইয়া রহিল।

নীলাম্বর বলিল, সত্যি বই কি মা—সব সত্যি। জান ত মা, রেগে গেলে সে পাগলীর জ্ঞান থাকত না। যখন এতটুকুটি ছিল, তখনও তাই, যখন বড় হ'ল, তখনও তাই। তাতে যে অত্যাচার, যে অপমান আমি করেছিলাম, সে সহ্য করতে বোধ করি স্বয়ং নারায়ণও পারতেন না—সে ত মানুষ। নীলাম্বর হাত দিয়া এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, মনে হ'লে বুক ফেটে যায় মা, হতভাগী তিন দিন খায়নি, জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে আমার জন্যে দুটি চাল ভিক্ষে করতে গিয়েছিল, সেই অপরাধে আমি—আর সে বলিতে পারিল না, কোঁচার খুঁট মুখে গুঁজিয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন সবলে নিরোধ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

ছোটবৌ নিজেও তেমনই করিয়া কাঁদিতেছিল, সেও কথা কহিল না। বহুক্ষণ কাটিল।

বহুক্ষণ পরে নীলাম্বর কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া চোখ মুছিয়া বলিল, অনেক কথাই তুমি জান, তবু শোন মা। কি ক'রে জানিনে, সেই রাতেই সে অজ্ঞান উন্মত্ত হয়ে সুন্দরীর বাড়ীতে গিয়ে উঠে, তার পরে—উঃ—টাকার লোভে সুন্দরী, পাগ্‌লীকে আমার সেই রাতেই রাজেনবাবুর বজরায় তুলে দিয়ে আসে—

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মোহিনী নিজেকে ভুলিয়া, লজ্জা সরম ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কক্ষণো সত্যি নয় বাবা, কক্ষণো সত্যি নয়। দিদির দেহে প্রাণ থাকতে এমন কাজ তাকে কেউ করাতে পারবে না। তিনি যে সুন্দরীর মুখ পর্য্যন্ত দেখতেন না।

নীলাম্বর শান্তভাবে বলিল, তাও শুনেচি। হয়ত তোমার কথাই সত্যি

মা, দেহে তার প্রাণ ছিল না। ভাল ক'রে জ্ঞান বুদ্ধি হ'বার পূর্ব্বেই সেটা সে আমাকে দিয়েছিল, সে ত নিয়ে যায় নি, আজও তা আমার কাছে আছে, বলিয়া সে চোখ বুজিয়া তাহার হৃদয়ের অন্তরতম স্থান পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিতে লাগিল।

ছোটবৌ মুগ্ধ হইয়া সেই শান্ত, পাণ্ডুর নিমীলিত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে মুখে ক্রোধ বা হিংসা-দ্বেষের এতটুকু ছায়া নাই—আছে শুধু অপরিসীম ব্যথা ও অনন্ত ক্ষমার অনির্ব্বচনীয় মহিমা। সে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া মনে মনে তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে মনে মনে বলিল, দিদি চিনেছিল, তাতেই একটি দিনও ছেড়ে থাকতে চাইত না।

দীর্ঘ চার বৎসর পরে পুঁটি বাপের বাড়ী আসিয়াছে এবং বড় মানুষের মতই আসিয়াছে। তাহার স্বামী, ছয়মাসের শিশুপুত্র, পাঁচ-ছয়জন দাস-দাসী এবং অগণিত জিনিস পত্রে সমস্ত বাটী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ষ্টেশনে নামিয়াই যদু চাকরের কাছে খবর শুনিয়া সে সেইখান হইতে কাঁদিতে সুরু করিয়াছিল। উচ্চরোলে কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া রাত্রি এক প্রহরের পর বাড়ী ঢুকিয়া দাদার ক্রোড়ে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। সে রাত্রে জলস্পর্শ করিল না, দাদাকেও ছাড়িল না; এবং মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াই সে একটু একটু করিয়া সমস্ত কথা শুনিল। আগে বৌদিকে বরঞ্চ সে ভয় করিত, সঙ্কোচ করিত, কিন্তু দাদাকে ঠিক পুরুষ-মানুষও মনে করিত না, সঙ্কোচও করিত না। সমস্ত আবদার উপদ্রব তাহার দাদার উপরেই ছিল। শ্বশুর বাড়ী যাইবার পূর্ব্বের দিনও সে বৌদির কাছে তাড়া খাইয়া আসিয়া দাদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিল। তাহার সেই দাদাকে যাহারা এতদিন ধরিয়া এত দুঃখ দিয়াছে, এমন জীর্ণ শীর্ণ, এমন পাগলের মত করিয়া দিয়াছে, তাহাদের প্রতি তাহার ক্রোধ ও দ্বেষের পরিসীমা রহিল না। তাহার দাদার এত বড় দুঃখের কাছে

পুঁটি আপনার সমস্ত দুঃখকেই একেবারে তুচ্ছ করিয়া দিল। তাহার শ্বশুর-কুলের উপর ঘৃণা জন্মিল, ছোটদার সর্পাঘাত তাহাকে বিঁধিল না এবং তাহার দুঃখিনী বিধবার দিক্ হইতে সে একেবারে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

দুদিন পরে সে তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, আমি দাদাকে নিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যাব, তুমি এই সব লট-বহর নিয়ে বাড়ী ফিরে যাও। আর যদি ইচ্ছে হয়, না হয় তুমিও সঙ্গে চল।

যতীন অনেক যুক্তি তর্কের পর শেষ কাজটাই সহজসাধ্য বিবেচনা করিয়া আর একবার জিনিস-পত্র বাঁধাবাঁধির উদ্যোগে প্রস্থান করিল। যাত্রার আযোজন চলিতে লাগিল। পুঁটি সুন্দরীকে একবার গোপনে ডাকাইযা পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সে আসিল না। যে ডাকিতে গিয়াছিল তাহাকে বলিয়া দিল, এ মুখ দেখাইতে পারিব না, এবং যাহা বলিবার ছিল বলিয়াছি, আর কিছু বলিবার নাই। পুঁটি ক্রোধে অধর দংশন করিয়া মৌন হইয়া রহিল। পুঁটির নিদারুণ উপেক্ষা ও ততোধিক নিষ্ঠুর ব্যবহার ছোটবৌকে যে কিরূপ বিঁধিল তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহ জানিল না। সে হাত জোড় করিয়া মনে মনে বড়জাকে স্মরণ করিয়া বলিল, দিদি, তুমি ছাড়া আমাকে আর কে বুঝবে! যেখানেই থাক, তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করে থাক, সেই আমার সর্ব্বস্ব। চিরদিনই সে নিস্তব্ধ প্রকৃতির, আজিও নীরবে সকলের সেবা করিতে লাগিল, কাহাকেও কোন কথাটি বলিল না। ভাসুরকে খাওয়াইবার ভার পুঁটি লইয়াছিল, এ কয়দিন সেখানেও বসিবার আবশ্যক হইল না।

যাইবার দিন নীলাম্বর অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুমি যাবে না মা?

ছোটবৌ নীরবে ঘাড় নাড়িল।

পুঁটি ছেলে কোলে করিয়া দাদার পাশে আসিয়া শুনিতে লাগিল।

নীলাম্বর বলিল, সে হবে না মা। তুমি একলাটি কেমন করেই বা থাকবে, আর থেকেই বা কি হবে মা? চল।

ছোটবৌ তেমনিই হেঁট মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবা, আমি কোথাও যেতে পারব না।

ছোটবৌর বাপের বাড়ীর অবস্থা খুব ভাল। বিধবা মেয়েকে তাঁরা অনেক বার লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই যায় নাই।

নীলাম্বর তখন মনে করিত, সে শুধু তাহারই জন্য যাইতে পারে না; কিন্তু এখন শূন্য বাটীতে কি হেতু একা পড়িয়া থাকিতে চাহে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কেন কোথাও যেতে পারবে না মা?

ছোটবৌ চুপ করিয়া রহিল।

না বল্‌লে ত আমারও যাওয়া হবে না মা!

ছোটবৌ মৃদু কণ্ঠে বলিল, আপনি যান, আমি থাকি।

কেন?

ছোটবৌ আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া মনে মনে একটা সঙ্কোচের জড়তা প্রাণপণে কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তারপর ঢোক গিলিয়া অতি মৃদু কণ্ঠে বলিল, কখনও যদি দিদি আসেন—তাই আমি কোথাও যেতে পারব না বাবা!

নীলাম্বর চমকিয়া উঠিল। খর বিদ্যুৎ চোখ-মুখ ধাঁধিয়া দিলে যেমন হয়, তেমনই চারিদিকে সে অন্ধকার দেখিল; কিন্তু মুহূর্তের জন্য। মুহূর্তেই নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া অতি ক্ষীণ একটুখানি হাসিয়া কহিল, ছি মা, তুমিও যদি এমন খ্যাপার মত কথা বল, এমন অবুঝ হয়ে যাও, তাহ'লে আমার উপায় কি হবে? ছোটবৌ চোখের পলকে চোখ বুজিয়া নিজের বুকের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, পরক্ষণে সংশয়লেশহীন, স্থির মৃদুস্বরে বলিল, অবুঝ হই নি বাবা! আপনার যা ইচ্ছে হয় বলুন, কিন্তু যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য উঠতে দেখব, তত দিন কারো কোন কথা আমি বিশ্বাস করব না।

ভাইবোন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে তেম্নি সুদৃঢ় কণ্ঠে বলিতে লাগিল, স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরণের বর দিদি আপনার কাছে চেয়ে নিয়েছিলেন, সে বর কোন মতেই নিষ্ফল হতে পারে না। সতীলক্ষ্মী দিদি আমার নিশ্চয় ফিরে আসবেন—যতদিন বাঁচ্‌ব, এই আশায় পথ চেয়ে থাক্‌ব—আমাকে কোথাও যেতে বলবেন না বাবা! বলিয়া এক নিশ্বাসে অনেক কথা কহার জন্য মুখ হেঁট করিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

নীলাম্বর আর সহিতে পারিল না; যে কান্না তাহার গলা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল, কোথাও একটু আড়ালে গিয়া তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

পুঁটি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তার পর কাছে আসিয়া তাহার ছেলেকে পায়ের নিচে বসাইয়া দিয়া আজ প্রথম সে এই বিধবা ভ্রাতৃজায়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অস্ফুটস্বরে কাঁদিয়া বলিল, বৌদি! কখনো তোমাকে চিনিতে পারি নি, বৌদি আমাকে মাপ কর।

ছোটবৌ হেঁট হইয়া তাহার ছেলেকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে মুখ দিয়া অশ্রু গোপন করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

১৪

বিরাজের মরাই উচিত ছিল কিন্তু মরিল না। সেই রাত্রে মরিবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তাহার বহুদিনব্যাপী দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত দুর্ব্বল বিকৃত মস্তিষ্ক অনাহার ও অপমানের অসহ্য আঘাতে মরণের পথ ছাড়িয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে পা বাড়াইয়া দিল। মৃত্যু বুকে করিয়া যখন আঁচল দিয়া হাত পা বাঁধিতেছিল, তখন কোথায় বাজ পড়িল, সেই ভীষণ শব্দে চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া তাহারই তীব্র আলোকে, ও-পারের সেই স্নানের ঘাট ও সেই

মাছ ধরিবার কাঠের মাচা তাহার চোখে পড়িয়া গেল। এগুলো এতক্ষণ ঠিক যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া তাহারই দৃষ্টি অপেক্ষা করিয়াছিল, চোখাচোখি হইবামাত্রই ইসারা করিয়া ডাক দিল। বিরাজ সহসা ভীষণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সাধু পুরুষ আমার হাতের জল পর্য্যন্ত খাবেন না, কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ খাবে ত! বেশ!

কামারের জাঁতার মুখে জ্বলন্ত কয়লা যেমন করিয়া গর্জ্জিয়া জ্বলিয়া ছাই হয়, বিরাজের প্রজ্বলিত মস্তিষ্কের মুখে ঠিক তেমনই করিয়া তাহার অতুল অমূল্য হৃদয়খানি জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। সে স্বামী ভুলিল. ধর্ম্ম ভুলিল, মরণ ভুলিল, একদৃষ্টে প্রাণপণে ও-পারের ঘাটের পানে চাহিয়া রহিল। আবার কড়্ কড়্ করিয়া অন্ধকারে আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল, তাহার বিস্ফারিত দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া নিজের প্রতি ফিরিয়া আসিল, একবার মুখ বাড়াইয়া জলের পানে চাহিল, একবার ঘাড় ফিরাইয়া বাড়ীর দিকে দেখিল, তাহার পর লঘুহস্তে নিজের বাঁধা বাঁধন খুলিয়া ফেলিয়া চক্ষের নিমেষে অন্ধকার বনের মধ্যে মিশিয়া গেল। তাহার দ্রুত পদশব্দে কত কি সর্ সর্ থস্ থস্ করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া গেল, সে ভ্রূক্ষেপও করিল না—সে সুন্দরীর কাছে চলিয়াছিল। পঞ্চানন ঠাকুর-তলায় তাহার ঘর, পূজা দিতে গিয়া সে কতবার তাহা দেখিয়া আসিয়াছে। এ গ্রামের বধূ হইলেও শৈশবে এ গ্রামের প্রায় সমস্ত পথ ঘাটই সে চিনিত, অল্পকালের মধ্যেই সে সুন্দরীর রুদ্ধ জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

ইহার ঘণ্টা-দুই পরেই কাঙালী জেলে তাহার পান্সীখানি ওপারের, দিকে ভাসাইয়া দিল। অনেক রাত্রেই সে পয়সার লোভে সুন্দরীকে ও-পারে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে, আজও চলিয়াছে, আজ শুধু একটির পরিবর্ত্তে দুটি রমণী নিঃশব্দে বসিয়া আছে। অন্ধকারে বিরাজের মুখ সে দেখিতে পাইল না, পাইলেও চিনিতে পারিত না। তাহাদের ঘাটের

কাছে আসিয়া দূর হইতে অন্ধকার তীরে একটা অস্পষ্ট দীর্ঘ ঋজু দেহ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বিরাজ চোখ বুজিয়া রহিল।

সুন্দরী চুপি চুপি আবার প্রশ্ন করিল, কে অমন করে মারলে বৌমা?

বিরাজ অধীর হইয়া বলিল, আমার গায়ে হাত তুলতে পারে, সে ছাড়া আর কে সুন্দরী, যে বার বার জিজ্ঞেস কচ্চিস্? সুন্দরী অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

আরো ঘণ্টা-দুই পরে একখানি সুসজ্জিত বজ্‌রা নোঙর তুলিবার উপক্রম করিতেই, বিরাজ সুন্দরীর পানে চাহিয়া বলিল, তুই সঙ্গে যাবি নে?

না বৌমা, আমি এখানে না থাকলে, লোকে সন্দেহ করবে; যাও মা, ভয় নেই আবার দেখা হবে।

বিরাজ আর কিছু বলিল না। সুন্দরী কাঙালীর পান্‌সীতে উঠিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

জমিদারের সুশ্রী বজ্‌রা বিরাজকে লইয়া তীর ছাড়িয়া ত্রিবেণীর অভিমুখে যাত্রা করিল। দাঁড়ের শব্দ ছাপাইয়া বাতাস চাপিয়া আসিল, দূরে একধারে মৌন রাজেন্দ্র নতমুখে বসিয়া মদ খাইতে লাগিল, বিরাজ পাষাণমূর্ত্তির মত জলের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আজ রাজেন্দ্র অনেক মদ খাইয়াছিল। মদের নেশা তাহার দেহের রক্তকে উত্তপ্ত এবং মগজকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া আনিতেছিল, বজ্‌রা যখন সপ্তগ্রামের সীমানা ছাড়িয়া গেল, তখন সে উঠিয়া আসিয়া কাছে বসিল। বিরাজের রুক্ষ চুল এলাইয়া লুটাইতেছে, মাথার আঁচল খসিয়া কাঁধের উপর পড়িয়াছে—কিছুতেই তাহার চৈতন্য নাই, কে আসিল, কে কাছে বসিল, সে ভ্রূক্ষেপও করিল না।

কিন্তু রাজেন্দ্রর এ কি হইল? একাকী কোন ভয়ঙ্কর স্থানে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে ভূত প্রেতের ভয়ে মানুষের বুকের মধ্যে যেমন তোলপাড়

করিয়া উঠে তাহারও সমস্ত বুক জুড়িয়া ঠিক তেমনই আতঙ্কের ঝড় উঠিল। সে চাহিয়া রহিল, ডাকিয়া আলাপ করিতে পারিল না।

অথচ এই রমণীটির জন্য সে কি না করিয়াছে। দুই বৎসর অহর্নিশ মনে মনে অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে, নিদ্রায় জাগরণে ধ্যান করিয়াছে, চোখের দেখা দেখিবার লোভে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া বনে-জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াছে—তাহার স্বপ্নের অগোচর এই সংবাদ, আজ যখন সুন্দরী ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহার কানে কানে কহিয়াছিল, সে ভাবের আবেশে অভিভূত হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এ সৌভাগ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।

সুমুখে নদী বাঁকিয়া গিয়া উভয় তীরে দুই প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়, বহু প্রাচীন বট ও পাকুড় গাছের ভিতর দিয়া গিয়াছিল, স্থানে স্থানে বাঁশ, কঞ্চি ও গাছের ডাল জলের উপর পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া সমস্ত স্থানটাকে নিবিড় অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল। বজ্‌রা এখানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বক্ষণে রাজেন্দ্র সাহস সঞ্চয় করিয়া, কণ্ঠের জড়তা কাটাইয়া কোনমতে বলিয়া ফেলিল, তুমি—আপনি—আপনি ভিতরে গিয়ে একবার বসুন—গায়ে ডালপালা লাগবে!

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া চাহিল। সুমুখে একটা ক্ষুদ্র দীপ জ্বলিতেছিল, তাহারই ক্ষীণ আলোকে চোখাচোখি হইল, পূর্ব্বেও হইয়াছে। তখন দুর্ব্বৃত্ত পরের জমির উপর দাঁড়াইয়াও সে দৃষ্টি সহিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আজ নিজের অধিকারের মধ্যে, নিজেকে মাতাল করিয়াও সে এ চাহনির সুমুখে মাথা সোজা রাখিতে পারিল না—ঘাড় হেঁট করিল।

কিন্তু বিরাজ চাহিয়া রহিল। তাহার এত কাছে পরপুরুষ বসিয়া অথচ মুখে তাহার আবরণ নাই, মাথায় এতটুকু আঁচল পর্য্যন্তও নাই। এই সময়ে বজ্‌রা ঘন ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের মধ্যে ঢুকিতেই দাঁড়ীরা দাঁড় ছাড়িয়া ডাল পালা সরাইতে ব্যস্ত হইল। নদী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় ভাটার টানও এখানে অত্যন্ত প্রখর। ওরে সাবধান! বলিয়া রাজেন্দ্র

দাঁড়ীদের সতর্ক করিয়া দিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিরাজের উদ্দেশে 'লাগবে, ভিতরে আসুন,' বলিয়া নিজে গিয়া কামরায় প্রবেশ করিল।

বিরাজ মোহাচ্ছন্ন, যন্ত্রচালিতের মত পিছনে আসিয়া ভিতরে পা দিয়াই অকস্মাৎ 'মা গো' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

সে চীৎকারে রাজেন্দ্র চমকাইয়া উঠিল। তখন, অস্পষ্ট দীপালোকে বিরাজের দুই চোখ, রক্তমাখা সিঁথার সিন্দূর চামুণ্ডার ত্রিনয়নের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে—মাতাল সে আগুনের সুমুখ হইতে আহত কুক্কুরের ন্যায় একটা ভীত ও বিকৃত শব্দ করিয়া কাঁপিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মানুষ না জানিয়া অন্ধকারে পায়ের নিচে ক্লেদাক্ত, শীতল ও পিচ্ছিল সরীসৃপ মাড়াইয়া ধরিলে যে ভাবে লাফাইয়া উঠে, তেমনিই করিয়া বিরাজ ছিট্‌কাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল—একবার জলের দিকে চাহিয়া, পরক্ষণে 'মা গো! এ কি কল্লুম মা!' বলিয়া অন্ধকার অতল জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

দাঁড়ী-মাঝিরা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, ছুটাছুটি করিয়া বজ্‌রা উল্টাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিল—আর কিছুই করিতে পারিল না। সবাই প্রাণপণে জলের দিকে চাহিয়াও সে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। শুধু রাজেন্দ্র এক চুল নড়িল না। নেশা তাহার ছুটিয়া গিয়াছিল, তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ স্রোতের টানে বজ্‌রা আপনি বাহিরে আসিয়া পড়ায় মাঝি উদ্বিগ্ন মুখে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, কি করা যাবে? পুলিশে খবর দিতে হবে ত? রাজেন্দ্র বিহ্বলের মত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, কেন, জেলে যাবার জন্যে? গদাই, যেমন ক'রে পারিস্ পালা। গদাই মাঝি পুরাতন লোক, বাবুকে চিনিত, সবাই চিনে—তাই ব্যাপারটা আগেই কতক অনুমান করিয়াছিল, এখন এই ইঙ্গিতে তাহার চোখ খুলিয়া গেল।

সে অপর সকলকে একত্র করিয়া চুপি চুপি আদেশ দিয়া বজ্‌রা উড়াইয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

কলিকাতার কাছাকাছি আসিয়া রাজেন্দ্র হাঁফ ছাড়িল। গত রজনীর সুগভীর অন্ধকারে মুখোমুখি হইয়া সে যে চোখ দেখিয়াছিল, স্মরণ করিয়া আজ দিনের বেলায় এতদূর আসিয়াও তাহার গা ছম্‌ ছম্‌ করিতে লাগিল। সে মনে মনে নিজের কান মলিয়া বলিল, ইহজীবনে ও-কাজ আর নয়। কিসের মধ্যে যে কি লুকান থাকে, কেহই জানে না। পাগ্‌লী যে কাল চোখ দিয়া তাহার পৈতৃক প্রাণটা শুষিয়া লয় নাই, ইহাই সে পরম ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিল এবং কোন কারণে কখনও সে যে ও-মুখো হইতে পারিবে, সে ভরসা তাহার রহিল না। মূর্খ কুলটা লইয়াই এতাবৎ নাড়াচাড়া করিয়াছে, সতী যে কি বস্তু, তাহা জানিত না। আজ পাপিষ্ঠের কলুষিত জীবনে প্রথম চৈতন্য হইল, খোলস লইয়া খেলা করা চলে, কিন্তু জীবন্ত বিষধর অত বড় জমিদার পুত্রেরও ক্রীড়ার সামগ্রী নহে।

১৫

সেদিন অপরাহ্ণে যে স্ত্রীলোকটি বিরাজের শিয়রে বসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিরাজ জানিল, সে হুগলির হাসপাতালে আছে। দীর্ঘকাল বাত-শ্লেষ্মা-বিকারের পর, যখন হইতে তাহার হুঁস হইয়াছে, তখন হইতেই সে ধীরে ধীরে নিজের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। একে একে অনেক কথা মনেও পড়িয়াছে।

একদিন বর্ষার রাত্রে স্বামী তাহার সতীত্বের উপর কটাক্ষ করিয়াছিলেন। তাহার পীড়ায় জর্জ্জর, উপবাসে অবসন্ন, ভগ্ন দেহ, বিকল মন সে নিদারুণ অপবাদ সহ্য করিতে পারে নাই। দুঃখে দুঃখে অনেক দিন

হইতেই সে হয় ত পাগল হইয়া আসিতেছিল। সেদিন অভিমানে, ঘৃণায় আর তাঁহার মুখ দেখিবে না বলিয়া সমস্ত বাঁধন ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিয়া নদীতে মরিতে গিয়াছিল—কিন্তু, মরে নাই।

তারপর জ্বর ও বিকারের ঝোঁকে বজ্‌রায় উঠিয়াছিল, এবং অর্দ্ধপথে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার দিয়া তীরে উঠিয়াছিল, ভিজা মাথায়, ভিজা কাপড়ে সারারাত্রি একাকী বসিয়া জ্বরে কাঁপিয়াছিল, শেষে কি করিয়া না জানি, এক গৃহস্থের দরজায় শুইয়া পড়িয়াছিল। এতটাই মনে পড়ে। কে এখানে আনিয়াছে, কবে আনিয়াছে, কত দিন এমন করিয়া পড়িয়া আছে—মনে পড়ে না। আর মনে পড়ে, সে গৃহত্যাগিনী কুলটা —পরপুরুষ আশ্রয় করিয়া গ্রামের বাহির হইয়াছিল।

ইহার পরে আর সে ভাবিতে পারিত না—ভাবিতে চাহিত না। তার পর ক্রমশঃ সারিয়া উঠিতে লাগিল, উঠিয়া বসিয়া একটু একটু করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু, ভবিষ্যতের দিক্ হইতে নিজের চিন্তাকে সে প্রাণপণে বিশ্লিষ্ট করিয়া রাখিল। সে যে কি ব্যাপার, তাহা তাহার প্রতি অণু-পরমাণু অহর্নিশ ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেছিল সত্য, কিন্তু যে যবনিকা ফেলা আছে, তাহার এতটুকু কোণ তুলিয়া দেখিতেও ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া যাইত, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া মূর্চ্ছার মত বোধ হইত। একদিন অগ্রহায়ণের প্রভাতে সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাহাকে কহিল, এখন সে ভাল হইয়াছে, এইবার তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে। আচ্ছা, বলিয়া বিরাজ চুপ করিয়া রহিল। সে স্ত্রীলোকটি হাসপাতালের লোক। সে বুঝিয়াছিল, এ পীড়িতার আত্মীয়-স্বজন সম্ভবতঃ কেহ নাই, কহিল, রাগ ক'রো না বাছা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাঁরা তোমাকে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁরা আর কোন দিন ত দেখ্‌তে এলেন না, তাঁরা কি তোমার আপনার লোক নয়?

বিরাজ বলিল, না, তাঁদের কখনও চোখে দেখি নি। একদিন বর্ষার

রাত্রে আমি ত্রিবেণীর কাছে ডুবে যাই। তাঁরা বোধ করি, দয়া ক'রে এখানে রেখে গিয়েছিলেন।

ওঃ, জলে ডুবেছিলে? তোমার বাড়ী কোথা গা?

বিরাজ মামার বাড়ীর নাম করিয়া বলিল, আমি সেখানেই যাব, সেখানে আমার আপনার লোক আছে।

স্ত্রীলোকটির বয়স হইয়াছিল, এবং বিরাজের মধুর স্বভাবের গুণে একটু মমতাও জন্মিয়াছিল, দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলিল, তাই যাও বাছা, একটু সাবধানে থেকো, দুদিনেই ভাল হয়ে যাবে।

বিরাজ একটুখানি হাসিয়া বলিল, আর ভাল কি হবে মা? এ চোখও ভাল হবে না, এ হাতও সারবে না।

রোগের পর তাহার বাঁ চোখ অন্ধ এবং বাঁ হাত পড়িয়া গিয়াছিল। স্ত্রীলোকটির চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, কহিল, বলা যায় না বাছা, সেরে যেতেও পারে।

পরদিন সে নিজের একখানি পুরাতন শীতবস্ত্র এবং কিছু পাথেয় দিয়া গেল, বিরাজ তাহা গ্রহণ করিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সহসা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি নিজের মুখখানা একবার দেখব—একটা আরসী যদি—

আছে বৈ কি, এখনই দিচ্চি, বলিয়া অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া একখানি দর্পণ বিরাজের হাতে দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বিরাজ আর একবার তাহার লোহার খাটের উপর ফিরিয়া গিয়া আরসী খুলিয়া বসিল। প্রতিবিম্বটার দিকে চাহিবামাত্রই একটা অপরিমেয় ঘৃণায় তাহার মুখ আপনি বিমুখ হইয়া গেল। দর্পণটা ফেলিয়া দিয়া সে বিছানায় মুখ ঢাকিয়া গভীর আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। মাথা মুণ্ডিত—তাহার সেই আকাশভরা মেঘের মত কাল চুল কই? সমস্ত মুখ এমন করিয়া কে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। সেই পদ্মপলাশ চক্ষু কোথায় গেল? অমন অতুলনীয় কাঁচা

সোনার মত বর্ণ কে হরণ করিল ? ভগবান ! এ কি গুরুদণ্ড করিয়াছ ! যদি কখনও দেখা হয়, এ মুখ সে কেমন করিয়া বাহির করিবে ! যত দিন এ দেহে প্রাণ থাকে, ততদিন আশা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া মরে না। তাই, তাহার হয়ত অতি ক্ষীণ একটু আশা অন্তঃসলিলার মত অতি নিভৃত অন্তস্তলে তখনও বহিতেছিল। দয়াময় ! সেটুকু শুকাইয়া দিয়া তোমার কি লাভ হইল ?

তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পরে রোগশয্যায় শুইয়া স্বামীর মুখ যখন উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত, তখন কখনও বা সহসা মনে হইত, যাহা সে করিয়াছে, সে ত অজ্ঞান হইয়াই করিয়াছে, তবে কি সে অপরাধের ক্ষমা হয় না ? সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, শুধু কি ইহারই নাই ? অন্তর্যামী ত জানেন, যথার্থ পাপ সে করে নাই, তথাপি যেটুকু হইয়াছে, সেটুকুও কি তাহার এত দিনের স্বামিসেবায় মুছিবে না ? মাঝে মাঝে বলিত, তাঁর মনে ত রাগ থাকে না, যদি হঠাৎ পায়ের উপর পড়ি, সব কথা খুলে বলি, আমার মুখের পানে চেয়ে কি করেন তা হ'লে। তাহা হইলে সম্ভবতঃ কি যে করেন, এই কল্পনাটাকে সে যে কত রঙে কত ভাবে ফুটাইয়া দেখিবার জন্য সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইত, ঘুম পাইলে উঠিয়া গিয়া চোখে মুখে জল দিয়া আবার নূতন করিয়া ভাবিতে বসিত—হা ভগবান ! তাহার সেই বিচিত্র ছবিটাকে কেন এমন করিয়া দুই পায়ে মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া দিলে ? সে তাহার স্বামীর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কোন্ লজ্জায় আর এ মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিবে !

ঘরে আর একজন রোগিণী ছিল, সে বিরাজের কান্না দেখিয়া উঠিয়া আসিয়া বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করিল, কি হ'ল গা ? কেন কাঁদছ ?

হায় রে ! আর একজন বিরাজের কান্নার হেতু জানিতে চায় !

বিরাজ তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল এবং কোনদিকে না চাহিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সেই দিন লোকপরিপূর্ণ শব্দমুখর রাজপথের একপ্রান্ত বাহিয়া যখন সে তাহার অনভ্যস্ত ক্লান্ত চরণ দুটিকে সারাজীবনের অনুদ্দিষ্ট যাত্রায় প্রথম পরিচালিত করিল, তখন, বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সে মনে মনে বলিল, ভগবান! হয়ত ভালই করিয়াছ। আর কেহ চাহিয়া দেখিবে না—এই মুখ, এই চোখ, হয়ত, এই যাত্রারই উপযুক্ত। গ্রামের লোক জানিয়াছে, সে গৃহত্যাগিনী কুলটা। তাই, সে মুখ তুলিয়া তাহার গ্রামের মুখ, তাহার স্বামীর মুখ দেখা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে মুখ হয়ত এমনই হওয়াই তোমার মঙ্গলের বিধান!—বিরাজ পথ চলিতে লাগিল।

কত দিন গত হইয়া গিয়াছে। প্রথম সে দাসীবৃত্তি করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার ভগ্ন দেহ অসমর্থ হইল—গৃহস্থ বিদায় দিলেন। তখন হইতে ভিক্ষাই তাহার উপজীবিকা। সে পথে পথে ভিক্ষা করে, গাছতলায় রাঁধিয়া খায়, গাছতলায় শোয়। এই বর্ত্তমান জীবনে, তাহার অতীতের তিলমাত্র চিহ্নও আর বিদ্যমান নাই। তাহার শতছিন্ন বস্ত্র, জটাবাঁধা রুক্ষ একটুখানি চুল, মলিন ভিক্ষালব্ধ একখানি ছোট কাঁথা গায়ে। এখন তাহার তেমনই দেহ, তেমনই বর্ণ, তেমনই সব। অথচ, এই তাহার পঁচিশ বৎসর মাত্র বয়স। এই দেহেরই তুলনা এক দিন স্বর্গেও মিলিত না। অতীত হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া ভগবান্ তাহাকে একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। সে নিজেও সব ভুলিয়াছে। শুধু ভুলিতে পারে নাই দুটি কথা। 'দাও' বলিতে এখনও তাহার মুখে রক্ত ছুটিয়া আসে—আজও কথাটা গলা দিয়া স্পষ্ট বাহির করিতে পারে না। আর ভুলিতে পারে না যে, তাহাকে অনেক দূরে গিয়া মরিতে হইবে। মরণের সেই স্থানটুকু তাহার কোন্ দেশান্তরে তাহা সে জানে না বটে, কিন্তু, এটা জানে, সেই সুদূরের জন্যই সে অবিশ্রাম পথ চলিয়াছে। সে যে কোনমতেই এ দশা তাহার স্বামীর দৃষ্টিগোচর করিতে পারিবে না, এবং দোষ তাহার যত অপ্রমেয়ই হউক, তাহার এ অবস্থা চোখে দেখিলে যে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইবে তাহা এক মুহূর্ত্তের তরেও বিস্মৃত হইতে পারে না বলিয়াই সে নিরন্তর দূরে সরিয়া যাইতেছিল।

একটা বৎসর পথ হাঁটিতেছে, কিন্তু কোথায় তাহার সেই অপরিচিত গম্যস্থান? কোথায় কোন্ ভূমিশয্যায় এই লজ্জাহত তপ্ত মাথাটা পাতিয়া

এই লাঞ্ছিত জীবনটা নিঃশব্দে শেষ করিতে পারিবে? আজ দুদিন হইতে সে একটা গাছতলায় পড়িয়া আছে—উঠিতে পারে নাই। আবার ধীরে ধীরে রোগে ঘিরিয়াছে—কাসি, জ্বর, বুকে ব্যথা। দুর্ব্বলদেহে শক্ত অসুখে পড়িয়া হাসপাতালে গিয়াছিল, ভাল হইতে না হইতেই এই পথশ্রম, অনশন ও অর্দ্ধাশন। তাহার বড় সবল দেহ ছিল বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে, আর বুঝি থাকে না। আজ চোখ বুজিয়া ভাবিতেছিল, এই বৃক্ষতলই কি সেই গম্যস্থান? ইহার জন্যই কি সে এত দেশ, এত পথ অবিশ্রাম হাঁটিয়াছে? আর কি সে উঠিবে না? বেলা অবসান হইয়া গেল। গাছের সর্ব্বোচ্চ চূড়া হইতে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রক্তাভা কোথায় সরিয়া গেল, সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি গ্রামের ভিতর হইতে ভাসিয়া আসিয়া তাহার কানে পৌঁছিল, সেই সঙ্গে তাহার নিমীলিত চোখের সম্মুখে অপরিচিত গৃহস্থ-বধূদের শান্ত মঙ্গল মূর্ত্তিগুলি ফুটিয়া উঠিল। এখন, কে কি করিতেছে, কেমন করিয়া দীপ জ্বালিতেছে, হাতে দীপ লইয়া কোথায় কোথায় দেখাইয়া ফিরিতেছে, এইবার গলায় আঁচল দিয়া নমস্কার করিতেছে, তুলসীতলায় দীপ দিয়া কে কি কামনা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিতেছে—এই সমস্ত সে চোখে দেখিতে লাগিল, কানে শুনিতে লাগিল। আজ অনেক দিন পরে তাহার চোখে জল আসিল। কত সহস্র বৎসর, যেন শেষ হইয়া গিয়াছে, সে কোন গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে পায় নাই, কাহারও মুখ মনে করিয়া ঠাকুরের পায়ে তাঁহার আয়ু ঐশ্বর্য্য মাগিয়া লয় নাই। এ সমস্ত চিন্তাকে সে প্রাণপণে সরাইয়া রাখিত, কিন্তু আর পারিল না। শাঁখের আহ্বানে তাহার ক্ষুধিত তৃষিত হৃদয় কোন নিষেধ না মানিয়া গৃহস্থ-বধূদের ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনশ্চক্ষে প্রতি ঘর-দোর, প্রতি প্রাঙ্গণ-প্রান্তর, বাঁধান তুলসী-বেদী, প্রতি দীপটি পর্য্যন্ত এক হইয়া গেল—এ যে সমস্তই তাহার চেনা; সবগুলিতেই এখন যে তাহারই হাতের চিহ্ন দেখা যাইতেছে! আর তাহার দুঃখ রহিল না, ক্ষুধা-তৃষ্ণা রহিল না,

পীড়ায় যাতনা রহিল না, সে তন্ময় হইয়া মনে মনে নিরন্তর বধূদের অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। যখন তাহারা রাঁধিতে গেল, সে সঙ্গে গেল, রান্না শেষ করিয়া যখন স্বামীদের খাইতে দিল, সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, তার পর সমস্ত কাজ-কর্ম্ম সমাধা করিয়া অনেক রাত্রে যখন তাহারা নিদ্রিত স্বামীদের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, সেও কাছে দাঁড়াইতে গিয়া সহসা শিহরিয়া উঠিল—এ যে তাহারই স্বামী! আর তাহার চোখের পলক পড়িল না, একদৃষ্টে নিদ্রিত স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল। গৃহ ছাড়িয়া পর্য্যন্ত এমন করিয়া একটি রাত্রিও ত তাহার কাছে আসে নাই! আজ তাহার ভাগ্যে এ কি অসহ্য সুখ! নিদ্রায় জাগরণে, তন্দ্রায় স্বপনে, এ কি মধুর নিশাযাপন।

বিরাজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বসিয়াছে। তখনও পূর্ব্বগগন স্বচ্ছ হয় নাই, তখনও দূরে ধূসর জ্যোৎস্না শাখা ও পাতার ফাঁকে ফাঁকে নামিয়া বৃক্ষতলে, তাহার চারিদিকে শেফালি পুষ্পের মত ঝরিয়া রহিয়াছে, সে ভাবিতেছিল, সে যদি অসতী, তবে কেন তিনি আজ এমন করিয়া দেখা দিলেন? তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইয়াছে, তাহাই কি জানাইয়া দিয়া গেলেন? তবে ত' এক মুহূর্ত্তও কোথাও সে বিলম্ব করিতে পারিবে না। সে উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। আজিকার রাত্রি সহসা তাহার রুদ্ধ দৃষ্টি সজোরে উদ্‌ঘাটিত করিয়া সমস্ত আনন্দে মাধুর্য্যে ভরিয়া দিয়া গিয়াছে! আর দেখা হউক বা না হউক, আর ত তাহাকে এক নিমিষের জন্যও স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবে না। এমন করিয়া তাঁহাকে যে পাইবার পথ ছিল, অথচ সে বৃথায় এত দিন স্বামীছাড়া হইয়া দুঃখ পাইয়াছে, এই ত্রুটিটা তাহাকে গভীর বেদনায় পুনঃ পুনঃ বিঁধিতে লাগিল। আজ কি করিয়া না জানি, তাহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে, তিনি ডাকিতেছেন।

বিরাজ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, ঠিক ত! এই দেহটা কি আমার আপনার

যে, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন এমন করিয়া নষ্ট করিতেছি! বিচার করিবার অধিকার আমার নয়,—তাঁর। যা করিবার, তিনিই করিবেন, আমি সব কথা তাঁর পায়ে নিবেদন করিয়া দিয়া ছুটি লইব। বিরাজ প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আজ তাহার দেহ লঘু, পদক্ষেপ যেন কঠিন মাটির উপর পড়িতেছে না, মন পরিপূর্ণ, কোথাও এতটুকু গ্লানি নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে সে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিল, তাহার এ কি বিষম ভুল! এ কি অহঙ্কার তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল! এই এরূপ কুৎসিত মুখ বিশ্বের সম্মুখে বাহির করিতে লজ্জা হয় নাই, শুধু লজ্জা হইয়াছিল তাঁর কাছে, যাঁর কাছে প্রকাশ করিবার একমাত্র অধিকার, তাহার নয় বৎসর বয়সে বিধাতা স্বয়ং নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

পুঁটি দাদাকে মুহূর্ত্তের বিশ্রাম দেয় না। পূজার সময় হইতে পৌষের শেষ পর্য্যন্ত ক্রমাগত নগরের পর নগরে, তীর্থের পর তীর্থে টানিয়া লইয়া ফিরিতেছিল। তার অল্প বয়স, সুস্থ সবল দেহ, অসীম কৌতূহল, তাহার সহিত সমানে পা ফেলিয়া চলা নীলাম্বরের সাধ্যাতীত—সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ, কোথাও বসিয়া একটুখানি জিরাইয়া লইবার ইচ্ছা না হইয়া কেন যে, সমস্ত দেহটা তাহার ঘরের পানে চাহিয়া অহর্নিশ পালাই পালাই করিতেছে, ভারাক্রান্ত মন দেশে ফিরিবার জন্য দিবানিশি কাঁদিয়া কাঁদিয়া নালিশ জানাইতেছে, ইহাও সে বুঝিতে পারিতেছে না। কি আছে দেশে? কেন এমন স্বাস্থ্যকর স্থানে মন বসে না? ছোটবৌ মাঝে মাঝে পুঁটিকে চিঠি দেয়, তাহাতেও এমন কোনও কথা থাকে না, তথাপি সেই বন-জঙ্গলের অবিশ্রাম টানে তাহার শীর্ণ দেহ কঙ্কালসার হইয়া উঠিতে লাগিল। পুঁটি চায়—দাদা সব ভুলিয়া আবার তেমনিই হয়। তেমনই সুস্থ সদানন্দ, তেমনই মুখে মুখে গান, তেমনই কারণে অকারণে উচ্চহাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার; কিন্তু দাদা তাহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল করিতে বসিয়াছে! আগে সে এমন ভাবিয়া দেখে নাই। হতাশ হয় নাই, মনে করিত, আরও দু'দিন যাক্; কিন্তু দুদিন করিয়া চার পাঁচ মাস কাটিয়া গেল, কৈ কিছুই ত হইল না। বাড়ী ছাড়িয়া আসিবার দিনে, মোহিনীর কথায় ব্যবহারে বিরাজের উপর তাহার একটা করুণার ভাব আসিয়াছিল, তাহার কথাগুলা বিশ্বাসও করিয়াছিল। দাদা ভাল হইয়া গেলে ছেলে-বেলার কথা মনে করিয়া সে হয় ত মনে মনে তাহাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করিতেও পারিত। বস্তুতঃ ক্ষমা করিবার জন্য, সেই বৌদিদিকে একটুখানি মাধুর্য্যের সহিত স্মরণ করিবার জন্য এক সময়ে সে নিজেও ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু সে সুযোগ তাহার মিলিতেছে কৈ? দাদা ভাল

হইতেছে কৈ? একে ত সংসারে এমন কোনও দুঃখ, কোনও হেতু সে কল্পনা করিতে পারে না, যাহাতে এই মানুষটিকে এত দুঃখে ফেলিয়া রাখিয়া কেহ সরিয়া দাঁড়াইতে পারে। বৌদি ভাল হউক, মন্দ হউক, পুঁটি আর ভ্রূক্ষেপ করে না, কিন্তু, ত্যাগ করিয়া যাইবার অমার্জ্জনীয় অপরাধে যে স্ত্রী অপরাধিনী, তাহার প্রতি বিদ্বেষেরও তাহার যেমন অন্ত রহিল না, সেই হতভাগিনীকে প্রত্যহ স্মরণ করিয়া তাহার বিচ্ছেদ এমন করিয়া মনে মনে লালন করিয়া, যে মানুষ নিজেকে ক্ষয় করিয়া আনিতেছে, তাহারও প্রতি তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইল না।

একদিন সকালে সে মুখ ভার করিয়া আসিয়া বলিল, দাদা, বাড়ী যাই চল। নীলাম্বর কিছু বিস্মিত হইয়াই বোনের মুখের পানে চাহিল, কারণ, মাঘ মাসটা প্রয়াগে কাটাইবার কথা ছিল। পুঁটি দাদার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল,—একটা দিনও আর থাকৃতে চাইনে, কালই যাব।

তাহার রুষ্ট ভাব অবলোকন করিয়া নীলাম্বর একটুখানি বিষণ্ণ ভাবে হাসিয়া বলিল, কেন রে পুঁটি?

পুঁটি এতক্ষণ জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিয়াছিল, এবার কাঁদিয়া ফেলিল। অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—কি হবে থেকে? তোমার ভাল লাগ্‌চে না, তুমি যাই যাই ক'রে প্রতিদিন শুকিয়ে উঠ্‌চ, না, আমি কিছুতেই আর এক দিনও থাকব না।

নীলাম্বর সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া বলিল, ফিরে গেলেই কি ভাল হয়ে যাব রে? এ দেহ সায়্‌বে ব'লে আর আমার ভরসা হয় না পুঁটি—তাই চল বোন, যা হবার ঘরে গিয়েই হউক।

দাদার কথা শুনিয়া পুঁটি অধিকতর কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল,—কেন তুমি সদাসর্ব্বদা তাকে এমন ক'রে ভাব্‌বে? শুধু ভেবেই ত এমন হ'য়ে যাচ্চ।

কে বল্‌লে, আমি তাকে সর্ব্বদা ভাবি?

পুঁটি তেমনই ভাবে জবাব দিল—কে আবার বল্‌বে, আমি নিজেই জানি।

তুই তাকে ভাবিস্‌নে ?

পুঁটি চোখ মুছিয়া উদ্ধতভাবে বলিল—না, ভাবিনে। তাকে ভাব্‌লে পাপ হয়।

নীলাম্বর চমকিত হইল—কি হয় ?

পাপ হয়। তার নাম মুখে আন্‌লে মুখ অশুচি হয়, মনে আন্‌লে স্নান কর্‌তে হয়, বলিয়াই সে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দাদার স্নেহকোমল দৃষ্টি এক নিমিষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর বোনের মুখের দিকে চাহিয়া কঠিন স্বরে বলিল, পুঁটি !

ডাক শুনিয়া সে ভীত ও অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে দাদার বড় আদরের বোন্, ছেলে বেলাতেও সহস্র অপরাধে কখনও এমন চোখ দেখে নাই, এমন গলা শুনে নাই। এখন বড় বয়সে বকুনি খাইয়া তাহার ক্ষোভে ও অভিমানে মাথা হেঁট হইয়া গেল।

নীলাম্বর আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া গেলে সে চোখে আঁচল দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দুপুর বেলা দাদার আহারের সময় কাছে গেল না, অপরাহ্ণে দাসীর হাতে খাবার পাঠাইয়া দিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলাম্বর ডাকিল না, কথাটি বলিল না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর আহ্নিক শেষ করিয়া সেই আসনেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে, পুঁটি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া পিছনে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাদার পিঠের উপর মুখ রাখিল। এটা তাহার নালিশ করার ধরণ। ছেলে বেলায় অপরাধ করিয়া বৌদির তাড়া খাইয়া এমনই করিয়া সে অভিযোগ করিত। নীলাম্বরের সহসা তাহা মনে পড়িয়া দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল, মাথায় হাত দিয়া কোমল স্বরে বলিল, কি রে ?

পুঁটি পিঠ ছাড়িয়া দিয়া কোলের উপর উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। নীলাম্বর তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে পুঁটি কান্নার সুরে বলিল, আর বল্‌ব না দাদা!

নীলাম্বর হাত দিয়া তাহার চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, না, আর ব'ল না।

পুঁটি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল! নীলাম্বর তাহার মনের কথা বুঝিয়া মৃদুস্বরে কহিল—সে তোর গুরুজন। শুধু সম্পর্কে নয় পুঁটি, তোকে মায়ের মত মানুষ ক'রে তোর মায়ের মতই হয়েচে। অপরে যা ইচ্ছে বলুক, কিন্তু তোর মুখে ও-কথায় গভীর অপরাধ হয়। পুঁটি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কেন সে আমাদের এমন ক'রে ফেলে রেখে গেল?

কেন যে গেল পুঁটি, সে শুধু আমি জানি, আর যিনি সর্ব্বান্তর্যামী তিনি জানেন। সে নিজেও জান্‌ত না—তখন সে পাগল হয়েছিল, তার এতটুকু জ্ঞান থাক্‌লে সে আত্মহত্যাই করত, এ কাজ করত না।

পুঁটি আর একবার চোখ মুছিয়া ভাঙা গলায় বলিল, কিন্তু এখন তবে কেন আসে না দাদা?

কেন আসে না। আস্‌বার যো নেই ব'লেই আসে না দিদি, বলিয়া সে নিজেকে জোর করিয়া সংবরণ করিয়া লইয়া ক্ষণকাল পরেই বলিল, যে অবস্থায় আমাকে ফেলে রেখে গেছে, তার এতটুকু ফেরবার পথ থাক্‌লে, সে ফিরে আস্‌ত—একটা দিনও কোথাও থাকত না। এ কথা কি তুই নিজেই বুঝিস্‌নে পুঁটি?

পুঁটি মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বুঝি দাদা—

নীলাম্বর উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, তাই বল বোন্। সে আস্‌তে চায়, পায় না! সে যে কি শাস্তি পুঁটি, তা তোরা দেখ্‌তে পাস্‌নে বটে, কিন্তু চোখ

বুঝলেই আমি তা দেখি। সেই দেখাই আমাকে নিত্য ক্ষয় ক'রে আন্‌চে রে, আর কিছুই নয়।

পুঁটি কাঁদিয়া ফেলিল।

নীলাম্বর হাত দিয়া নিজের চোখ মুছিয়া লইয়া বলিল, সে তার দুটো সাধের কথা আমাকে যখন তখন বল্‌ত। এক সাধ, শেষ সময়ে আমার কোলে যেন মাথা রাখতে পায়; আর সাধ, সীতা-সাবিত্রীর মত হ'য়ে মরণের পরে যেন তাদের কাছেই যায়। হতভাগীর সব সাধই ঘুচেছে।

পুঁটি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

নীলাম্বর রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, তোরা সবাই তার অপবাদ দিস্, বারণ করতে পারিনে ব'লে আমিও চুপ ক'রে থাকি, কিন্তু ভগবানকে ফাঁকি দিই কি ক'রে বল দেখি? তিনি ত দেখ্‌চেন, কার ভুল, কার অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে সে ডুবে গেল। তুই বল্, আমি কোন্ মুখে তার দোষ দিই, আমি তাকে আশীর্ব্বাদ না ক'রে কি ক'রে থাকি। না বোন, সংসারের চোখে সে যত কলঙ্কিনীই হোক, তার বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ, কোন নালিশ নাই। নিজের দোষে এ জন্মে তাকে পেয়েও হারালাম, ভগবান করুন, যেন পরজন্মেও তাকে পাই।

সে আর বলিতে পারিল না, এইখানে তাহার গলা একেবারে ধরিয়া গেল। পুঁটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আঁচল দিয়া দাদার চোখ মুছাইয়া দিতে গিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিল; সহসা তাহার মনে হইল, দাদা যেন কোথায় সরিয়া যাইতেছে। কাঁদিয়া বলিল, যেখানে ইচ্ছে চল দাদা, কিন্তু আমি তোমাকে একটি দিনও কোথাও একলা ছেড়ে দিব না।

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল।

বিরাজ জগন্নাথের পথে ফিরিয়া আসিতেছিল। এই পথ ধরিয়া যখন সে

অনির্দ্দিষ্ট মৃত্যুশয্যার অনুসন্ধানে গিয়াছিল, সেই যাওয়ায় আর এই আসায় কি প্রভেদ। এখন সে বাড়ী যাইতেছে। তাহার দুর্ব্বল দেহ পথে যতই সকাতরে বিশ্রাম ভিক্ষা চাহিতে লাগিল, সে ততই ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কোন কারণে কোথাও বিলম্ব করিতে সে সম্মত নয়। তাহার কাসি যক্ষ্মায় পরিণত হইয়াছে, ইহা সে টের পাইয়াছিল, তাই আশঙ্কার অবধি ছিল না, পাছে যাওয়া না ঘটে। ছেলে-বেলা হইতে একটা বিশ্বাস তাহার বড় দৃঢ় ছিল, দেহ নিষ্পাপ না হইলে কেহ স্বামীর পায়ে মরিতে পায় না। সে এই উপায়ে মরণের পূর্ব্বে একবার নিজের দেহটাকে যাচাই করিয়া লইতে চায়—তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সে নির্ভয়ে মহানন্দে জীবনের পরপারে দাঁড়াইয়া তাঁর জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে; কিন্তু দামোদরের এধারে আসিয়া তাহার হাত-পা ফুলিয়া উঠিল, মুখ দিয়া অধিক পরিমাণে রক্ত পড়িতে লাগিল—আর কিছুতেই পা চলিল না। সে হতাশ হইয়া একটা গাছতলায় ফিরিয়া আসিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। এ কি ভয়ানক অপরাধ যে, এত করিয়াও তাহার শেষ আশা মিটিল না! তাহার এ জন্ম গেল, পরজন্মেও আশা নাই, তবে সে আর কি করিবে! আশা নাই তবুও সে গাছতলায় পড়িয়া সারাদিন হাত জোড় করিয়া স্বামীর পায়ে মিনতি জানাইতে লাগিল।

পরদিন তারকেশ্বরের কাছাকাছি কোথায় হাটবার ছিল। প্রভাত হইতে সে পথে গরুর গাড়ী চলিতে লাগিল। সে সাহসে ভর করিয়া এক বৃদ্ধ গাড়োয়ানকে আবেদন করিল। বুড়ো মানুষ তাহার কান্না দেখিয়া, সম্মত হইয়া তাহাকে গাড়ী করিয়া তারকেশ্বরে পৌছাইয়া দিয়া গেল। বিরাজ স্থির করিল, এই মন্দিরের আশে-পাশে কোথাও সে পড়িয়া থাকিবে। এখানে কত লোক আসে যায়, যদি কোন উপায়ে একবার ছোটবৌয়ের কাছে সংবাদ পাঠাইতে পারে।

কঠিন-ব্যাধি-পীড়িত কত নর-নারী, কত কামনায় এই দেব-মন্দির ঘেরিয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে, তাহাদের মধ্যে আসিয়া বিরাজ অনেক দিনের পর একটু শান্তি অনুভব করিল। তাহাদের মত তাহারও ব্যাধি আছে, কামনা আছে, সে তাই লইয়া এখানে নীরবে পড়িয়া থাকিতে পাইবে, কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না, কাহারও অর্থহীন কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হইবে না মনে করিয়া এত দুঃখের মাঝেও আরাম পাইল; কিন্তু রোগ দ্রুত বাড়িয়া চলিতে লাগিল। মাঘের এই দুর্জ্জয় শীতে ও অনাহারে ছয়দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু আর কাটিবে বলিয়াও আশা হইল না, কেহ আসিবে বলিয়াও ভরসা রহিল না। ভরসা রহিল শুধু মৃত্যুর—সে তারই জন্য আর একবার নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল; অপরাহ্ণ না হইতেই আঁধার বোধ হইতে লাগিল। ও-বেলায় তাহার মুখ দিয়া অনেকখানি রক্ত উঠায় মৃতকল্প দেহটা যেন একেবারে নিঃশেষে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সে মনে মনে বলিল, বুঝি আজই সব সাঙ্গ হইবে এবং তখন হইতে মন্দিরের পিছনে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ঠাকুরের পূজা হইয়া গেলে অন্য দিনের মত উঠিয়া বসিয়া নমস্কার করিতে পারিল না—মনে মনে করিল। এত দিন স্বামীর চরণে সে শুধু মিনতি জানাইয়াই আসিয়াছে। সে অবোধ নয়, যে কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে এ জন্মের কোন দাবি রাখে নাই, শুধু পরজন্মের অধিকার না যায়, ইহাই চাহিয়াছে। না বুঝিয়া অপরাধ করার শাস্তি যেন এ জন্ম অতিক্রম করিয়া পরজন্ম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইতে না পায়, এই ভিক্ষাই মাগিয়াছে; কিন্তু বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তার ধারা সহসা এক আশ্চর্য্য পথে ফিরিয়া গেল। ভিক্ষার ভাব রহিল না, বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। সমস্ত চিত্ত ভরিয়া এক অপূর্ব্ব অভিমানের সুর অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে বাজিয়া উঠিল।

সে তাহাতেই মগ্ন হইয়া কেবলই মনে মনে বলিতে লাগিল, কেন তবে তুমি বলেছিলে !

অজ্ঞাতসারে কখন্ তাহার পঙ্গু বাঁ হাতখানি স্খলিত হইয়া পথের উপর পড়িয়াছিল, সে টের পায় নাই, সহসা তাহারই উপর একটা কঠিন ব্যথা পাইয়া সে অস্ফুটস্বরে কাতরোক্তি করিয়া উঠিল। এটা যাতায়াতের পথ। যে ব্যক্তি না দেখিয়া এই অবশ শীর্ণ হাতখানি মাড়াইয়া দিয়াছিল, সে অতিশয় লজ্জিত ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আহা হা—কে গা এমন ক'রে পথের ওপর শুয়ে আছ ? বড় অন্যায় করেচি—বেশি লাগেনি ত ?

চক্ষের পলকে বিরাজ মুখের কাপড় সরাইয়া চাহিয়া দেখিল, তার পর আর একটা অস্ফুট ধ্বনি করিয়া চুপ করিল। এই ব্যক্তি নীলাম্বর। সে একবার একটুকু ঝুঁকিয়া দেখিয়া সরিয়া গেল।

কিছুক্ষণে সূর্য্য অস্ত গেল। পশ্চিম-দিগন্তে মেঘ ছিল না, দিক-চক্রবাল বিচ্ছুরিত স্বর্ণাভা মন্দিরের চূড়ায়, গাছের আগায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, নীলাম্বর দূরে দাঁড়াইয়া পুঁটিকে কহিল, ওই রোগা মেয়ে-মানুষটিকে বড় মাড়িয়ে দিয়েচি বোন, দেখ্ দেখি যদি কিছু দিতে পারিস্—বোধ করি ভিক্ষুক।

পুঁটি চাহিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি একদৃষ্টে তাহাদেরই দিকে চাহিয়া আছে। তাই সে ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের কিয়দংশ বস্ত্রাবৃত, তথাপি মনে হইল, এ মুখ যেন সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, তোমার বাড়ী কোথায় ?

সাতগাঁয়ে, বলিয়া স্ত্রীলোকটি হাসিল।

বিরাজের সব চেয়ে মধুর সামগ্রী ছিল তাহার মুখের হাসি ; এ হাসি সমস্ত সংসারের মধ্যে কাহারও ভুল করিবার যো ছিল না। ওগো এ যে বৌদি বলিয়া সেই মুহূর্ত্তেই পুঁটি সেই জীর্ণ-শীর্ণ দেহের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মুখে মুখ দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলাম্বর দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কথাবার্ত্তা শুনিতে না পাইলেও সমস্ত বুঝিল। সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তারপর শান্ত-কণ্ঠে বলিল, এখানে কাঁদিস্ নে পুঁটি, ওঠ, বলিয়া ভগিনীকে সরাইয়া দিয়া স্ত্রীর শীর্ণ দেহ ক্ষুদ্র শিশুটির মত বুকে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিয়া গেল।

চিকিৎসার জন্য উত্তম স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার জন্য বিরাজকে অনেক সাধ্য-সাধনা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন মতেই তাহাকে রাজী করান যায় নাই। আর ঘর ছাড়িয়া যাইতে সে কিছুতেই সম্মত হইল না।

নীলাম্বর পুঁটিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া দিল, আর ক'টা দিন বোন? যেখানে যেমন ক'রে ও থাকতে চায় দে। আর ওকে তোরা কেউ পীড়াপীড়ি করিস্ নে।

তারকেশ্বরে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া সে প্রথম আবেদন জানাইয়াছিল, তাহাকে ঘরে লইয়া চল, তাহার নিজের শয্যার উপরে শোয়াইয়া দাও। ঘরের উপর, ঘরের প্রতি সামগ্রীটির উপর এবং স্বামীর উপর তাহার কি যে ভীষণ তৃষ্ণা, তাহা যে কেহ চোখে দেখে, সেই উপলব্ধি করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই সে জ্বরে আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকে, কিন্তু একটু সজাগ হইলেই ঘরের প্রতি বস্তুটি তন্ন তন্ন করিয়া চাহিয়া দেখে।

নীলাম্বর শয্যা ছাড়িয়া প্রায়ই কোথাও যায় না এবং প্রায়ই সজল চক্ষে প্রার্থনা করে, ভগবান অনেক শাস্তি দিয়াছ, এইবার ক্ষমা কর। যে লোক পরলোকে যাত্রা করিয়াছে, তাহার ইহলোকের মোহ কাটাইয়া দাও।

গৃহত্যাগিনীর গৃহের উপর এই নিদারুণ আকর্ষণ দেখিয়া সে মনে মনে

কণ্টকিত হইয়া উঠিতে থাকে। দুই সপ্তাহ গত হইয়াছে। কাল হইতে তাহার বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। আজ সারাদিন ভুল বকিয়া কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সন্ধ্যার পর চোখ মেলিয়া চাহিল। পুঁটি কাঁদিয়া কাটিয়া পায়ের কাছে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। ছোটবৌ শিয়রের কাছে বসিয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া বলিল, ছোটবৌ না ?

ছোটবৌ মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, হাঁ দিদি, আমি মোহিনী।

পুঁটি কোথায় ?

ছোটবৌ হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, তোমার পায়ের কাছে ঘুমাচ্চে।

উনি কৈ ?

ও-ঘরে আহ্নিক ক'চ্চেন।

তবে আমিও করি, বলিয়া সে চোখ বুজিয়া মনে মনে জপ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ডান হাত ললাটে স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিল, তার পর ছোটবৌয়ের মুখের পানে ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বোধ করি আজই চল্‌লুম বোন, কিন্তু আবার যেন দেখা হয়, আবার যেন তোকেই এমন কাছে পাই।

বিরাজের সময় যে একেবারে শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কাল হইতে তাহা সকলেই টের পাইয়াছিল, তাহার কথা শুনিয়া ছোটবৌ নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

বিরাজের বেশ জ্ঞান হইয়াছে। সে কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া চুপি চুপি বলিল, ছোটবৌ, সুন্দরীকে একবার ডাক্‌তে পারিস্ !

ছোটবৌ রুদ্ধশ্বাসে বলিল, আর তাকে কেন দিদি ? সে আস্‌বে না।

আস্‌বে রে আস্‌বে। একবার ডাকা—আমি তাকে মাপ ক'রে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই। আর আমার কারও ওপর রাগ নেই, কারও

ওপর কোনও ক্ষোভ নেই। ভগবান আমাকে যখন ক্ষমা ক'রে আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমিও তখন সকলকে ক্ষমা ক'রে যেতে চাই।

ছোটবৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, এ আর ক্ষমা কি দিদি? বিনা অপরাধে এত দণ্ড দিয়েও তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল না—তিনি তোমাকেও নিতে বসেছেন। একটা হাত নিলেন, তবুও যদি তোমাকে আমাদের কাছে ফেলে রেখে দিতেন—

বিরাজ হাসিয়া উঠিল; বলিল, কি করতিস্ আমাকে নিয়ে? পাড়ায় দুর্নাম রটেছে—আমার বেঁচে থাকায় আর ত লাভ নেই বোন!

ছোটবৌ গলায় জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, আছে দিদি, তা ছাড়া ও ত মিথ্যে দুর্নাম—ওতে আমরা ভয় করি নে।

তোরা করিস্ নে আমি করি। দুর্নাম মিথ্যে নয়, খুব সত্যি। আমার অপরাধ যতটুকুই হয়ে থাক্ ছোটবৌ, তার পরে আর হিন্দুর ঘরের মেয়ের বাঁচা চলে না। তোরা ভগবানের দয়া নেই বল্‌চিস্, কিন্তু—

তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পুঁটি উচ্ছ্বসিত কান্নার স্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, ওঃ ভারি দয়া ভগবানের!

এতক্ষণ সে চুপ করিয়া কাঁদিতেছিল—আর শুনিতেছিল। আর সে সহ্য করিতে না পারিয়া অমন করিয়া উঠিল। কাঁদিয়া বলিল, তাঁর এতটুকু দয়া নাই, এতটুকু বিচার নেই। যারা আসল পাপী, তাদের কিছু হ'ল না, আর আমাদেরই তিনি এমনই ক'রে শাস্তি দিচ্চেন!

তাহার কান্নার দিকে চাহিয়া বিরাজ নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। কি মধুর, কি বুক-ভাঙ্গা হাসি। তার পর কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে বলিল, চুপ কর পোড়ারমুখী, চেঁচাস নে।

পুঁটি ছুটিয়া আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, তুমি ম'রো না বৌদি, আমরা কেউ সইতে পার্‌ব না। তুমি ওষুধ খাও—আর কোথাও চল—তোমার দুটি পায়ে পড়ি বৌদি, আর দুটো দিন বাঁচ।

তাহার কান্নার শব্দে আহ্নিক ফেলিয়া নীলাম্বর ত্রস্তপদে কাছে আসিয়া শুনিতে লাগিল, পুঁটির যা মুখে আসিল, সে তাই বলিয়া বাঁচিবার জন্য বৌদিকে ক্রমাগত অনুনয় করিতে লাগিল। এইবার বিরাজের দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িল। ছোটবৌ সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিয়া পুঁটিকে টানিয়া লইতেই, সে তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সকলকে কাঁদাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে বিরাজ অনবরত ভগ্ন কণ্ঠে বলিতে লাগিল, কাঁদিস্ নে পুঁটি, শোন।

নীলাম্বর আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল, বিরাজের চৈতন্য সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে তাহা সে বুঝিল। বিরাজ বলিতে লাগিল, না বুঝে তাঁর দোষ দিস্ নে পুঁটি। কি সূক্ষ্ম বিচার তবু যে কত দয়া সে কথা আজ আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না। মরাই আমার বাঁচা, সে কথা আমি গেলেই তোরা বুঝ্‌বি। আর বল্‌চিস্— একটা হাত আর একটা চোখ নিয়েচেন, সে ত দুদিন আগে পাছে যেতই; কিন্তু এইটুকু শাস্তি দিয়ে তিনি তোদের কোলে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েচেন, সেটা তোরা কি ক'রে ভুল্‌বি পুঁটি?

ছাই ফিরিয়ে দিয়েছেন, বলিয়া পুঁটি কাঁদিতেই লাগিল।

ভগবানের দয়া বা সূক্ষ্ম বিচারের একটা বর্ণও সে বিশ্বাস করিল না। বরং সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে গভীর অত্যাচার ও অবিচার বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। খানিক পরে বিরাজ বলিল, পুঁটি, অনেকক্ষণ দেখি নি রে, তোর দাদাকে একবার ডাক্।

নীলাম্বর আড়ালেই ছিল, কাছে আসিতেই ছোটবৌ বিছানা ছাড়িয়া

সরিয়া দাঁড়াইল। নীলাম্বর শিয়রে বসিয়া স্ত্রীর ডান হাতটা সাবধানে নিজের হাতে তুলিয়া নাড়ী দেখিতে লাগিল। সত্যই বিরাজের আর কিছু ছিল না। সে যে জ্বরের উপর এত কথা বলিতেছে এবং ইহারই অবসানের সঙ্গে খুব সম্ভব সমস্তই শেষ হইবে, তাহা সে পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিল, এখন তাহাই বুঝিল।

বিরাজ বলিল, বেশ হাত দেখ, বলিয়াই হাসিল।

সহসা সে মর্ম্মান্তিক পরিহাস করিয়া ফেলিল। এই উপলক্ষ করিয়াই যে এত কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা সকলেরই মনে পড়িয়া গেল। বেদনায় নীলাম্বরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, বিরাজও বোধ করি তাহা দেখিতে পাইল। সে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, না না, তা বলিনি—সত্যিই বল্‌চি, আর কত দেরী? বলিয়া চেষ্টা করিয়া নিজের মাথা স্বামীর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়া বলিল, সকলের সুমুখে আর একবার তুমি বল, আমাকে মাপ করেচ?

নীলাম্বর রুদ্ধস্বরে 'করেচি' বলিয়া হাত দিয়া চোখ মুছিল।

বিরাজ ক্ষণকাল চোখ বুজিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, জ্ঞানে, অজ্ঞানে, এতদিনের ঘরকন্নায় কতই না দোষ ঘাট করেচি—ছোটবৌ তুমিও শোন, পুঁটি, তুইও শোন্ দিদি, তোমরা সব ভুলে আজ আমাকে বিদেয় দাও—আমি চল্লুম, বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া স্বামীর পদতল খুঁজিতে লাগিল। নীলাম্বর মাথার বালিশটা এক পাশে সরাইয়া দিয়া উপরে পা তুলিতেই বিরাজ হাত দিয়া ক্রমাগত পায়ের ধূলা মাথায় দিতে দিতে বলিল, আমার সব দুঃখ এতদিনে সার্থক হ'ল—আর কিছু নেই। দেহ আমার শুদ্ধ নিষ্পাপ—এইবার যাই, গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি গে। বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, এমনই ক'রে আমাকে নিয়ে থাক, কোথাও যেও না, বলিয়া সে নীরব হইল। সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সকলেই শুষ্ক মুখে বসিয়া রহিল। রাত্রি বারটার পর হইতে সে ভুল বকিতে লাগিল। নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ার কথা—হাসপাতালের কথা—নিরুদ্দেশ পথের কথা—কিন্তু, সব কথার মধ্যেই অত্যুগ্র, একাগ্র পতিপ্রেম। মুহূর্ত্তের ভ্রমে কি করিয়া সে সতী-সাধ্বীকে দগ্ধ করিয়াছে শুধুই তাই।

এ কয়দিন তাহারই সুমুখে বসিয়া নীলাম্বরকে আহার করিতে হইত; সেদিন মাঝে মাঝে সে পুঁটিকে ডাকিয়া ছোটবৌকে ডাকিয়া বকিতে লাগিল। তার পর, ভোর-বেলায় সমস্ত ডাকাডাকি দমন করিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিল। আর সে চাহিল না, আর সে কথা কহিল না, স্বামীর দেহে মাথা রাখিয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখিনীর সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া গেল।

সম্পূর্ণ
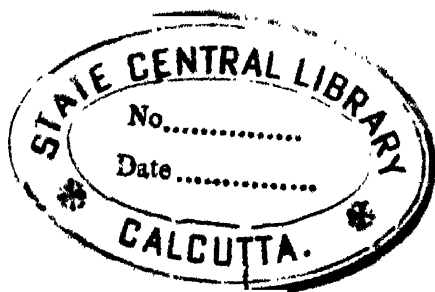
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬